Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৭তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জুন ২০১৪

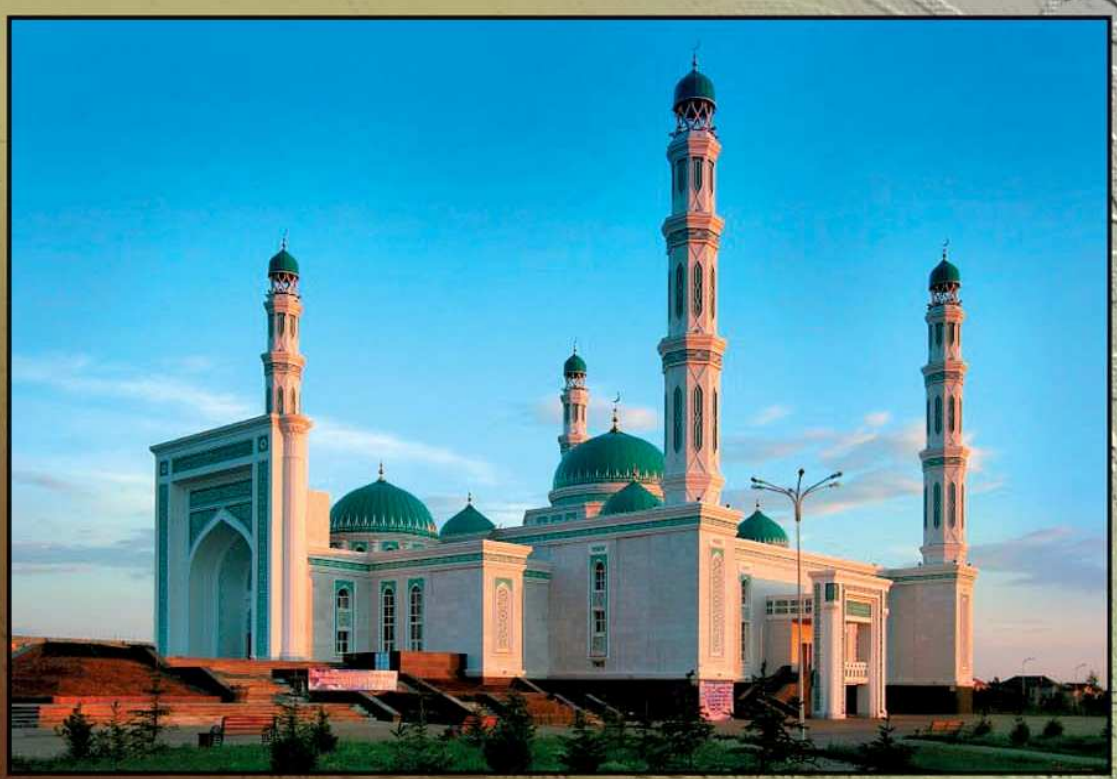

মাসিক

আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা জুন ২০১৪

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **দরসে হাদীছ :** ০৩

♦ হে মানুষ! আল্লাহকে লজ্জা কর
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

✡ **প্রবন্ধ :**

♦ কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীরে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা ০৭
-অনুবাদ: নূরুল ইসলাম

♦ বিদ'আত ও তার পরিণতি *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ১৬
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

♦ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ১৯
-আত-তাহরীক ডেস্ক

♦ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২১
-আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

♦ মানবাধিকার ও ইসলাম ২৭
-শামসুল আলম

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
মোদীর বিজয়ে ভারত কী হারাল? ৩১
-ইউলিয়াম ডালরিম্পল।

✡ **দিশারী :**
আহলেহাদীছ ফিৎনা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কোর্স! ৩৩

✡ **সাক্ষাৎকার :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩৪

✡ **কবিতা :** ৩৮
♦ আখেরাতের যাত্রী ♦ দাওরে যাকাত
♦ দুঃখের কথা ♦ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা
♦ বিদ্রোহ

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০

✡ **মুসলিম জাহান** ৪১

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৭

নীরব ঘাতক মোবাইল টাওয়ার থেকে সাবধান!

বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ ও শব্দ দূষণের চাইতে ভয়াবহ দূষণ হ'ল মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশন দূষণ। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও বিদ্যুতের লাইনের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এই ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। যা আধুনিক প্রযুক্তি অভিশাপের ডালায় একটি নতুন সংযোজন। ডঃ মার্টিন কুপারের হাতে যা ১৯৭৩ সালে নিউইয়র্কে জন্ম লাভ করে এবং ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে প্রথম বাংলাদেশে চালু হয়। গন্ধ, বর্ণ ও শব্দহীন এই অদৃশ্য ঘাতক তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণের ফলে 'স্লো পয়জন'-এর মতো দেশে ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির উদ্ভব ঘটেছে। মানুষ ও জীবজগতের সবাই এই মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মোবাইল টাওয়ার লোকালয়, বাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে স্থাপিত হওয়ায় এই ঝুঁকি শতগুণ বেড়ে গেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রেডিয়েশনের মাত্রা মনিটর করা হলেও আমাদের দেশে তার ব্যবস্থা নেই। ফলে লোভী কোম্পানীগুলো যত্রতত্র টাওয়ার বসাচ্ছে আর মানুষ অল্প কিছু টাকার জন্য এই আত্মঘাতি পথে প্রলুব্ধ হচ্ছে। যেখানে-সেখানে বিল্ডিংয়ের মাথায় প্রায় দু'টন ও তার অধিক ওজনের টাওয়ারগুলি বসানো হচ্ছে। যা পরে ঐ বিল্ডিং-এর জন্য মরণ ফাঁদে পরিণত হয়।

গত বছর ২৩শে এপ্রিলে সাভারের নয় তলা রাণা প্লাজা ধসের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই বিধ্বংসী মোবাইল টাওয়ার, যা ঐ প্লাজার ছাদে বসানো ছিল। যাতে ১১৩৫ জন হতভাগ্য মানুষের জীবন্ত সমাধি হয় এবং শত শত মানুষ পঙ্গু হয়। বিশ্বে মন্দ রেকর্ড সৃষ্টিকারী এতবড় ধ্বংসলীলার পরেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়লে এইসব টাওয়ারযুক্ত বিল্ডিংগুলির অবস্থা ও সেখানে বসবাসকারীদের অবস্থা কেমন হবে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সেই সাথে টাওয়ারের বৈদ্যুতিক তার থেকে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে বিস্তীর্ণ এলাকা ভস্মীভূত হতে পারে। টাওয়ারের ওজন সইতে না পেরে যদি কোন বিল্ডিং এভাবে ধসে পড়ে, তাহ'লে অগণিত রাণা প্লাজা ধসের ঘটনা ঘটে যাবে সারা দেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাদে এই টাওয়ার বসানো হয়েছে। ফলে এই বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক-ছাত্র এখন ক্যান্সার আতংকে রয়েছেন। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত উদয়ন স্কুলের ছাদে কয়েকটি মোবাইল কোম্পানী টাওয়ার বসিয়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের আতংক ও প্রতিবাদকে আদৌ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। দৈনিক ৬/৭ ঘণ্টা ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে অবস্থান করে। স্কুলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাযার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক এইসব টাওয়ারের সার্বক্ষণিক বিকিরণের অসহায় শিকার। এভাবে অর্থলোভী দালান মালিক ও টাওয়ার মালিকদের যোগসাজশে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে মানুষ ও জীবজগত। বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে যেসব প্রতিষ্ঠানের ছাদে বা কাছাকাছিতে টাওয়ার বসানো হয়েছে, তার বিকিরণের কুপ্রভাবে এখনকার শিশুরা ২০ বছর পরে লিউকোমিয়া (রক্তস্বল্পতা), ক্যান্সার, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। বিশেষ করে যারা এসব টাওয়ারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অর্থাৎ লাইন ম্যান, ইলেকট্রিক অপারেটর বা অনুরূপ পেশায় দায়িত্বরত, তারাই এসব রোগে দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া এইসব লাইনের নিকটবর্তী এবং দুই টাওয়ারের মধ্যবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করে, তারা দূরবর্তীদের তুলনায় বেশী এবং দ্রুত আক্রান্ত হয়।

মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশনের কারণে মানুষের ব্রেইন টিউমার, ক্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, নিদ্রাহীনতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও গর্ভপাত সহ মারাত্মক রোগসমূহ অকল্পনীয় মাত্রায় বেড়ে গেছে। এছাড়াও এর রেডিয়েশন আমাদের মগযের মধ্যে ঢুকে ডিএনএ ভেঙ্গে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। দেহের নার্ভের সেল নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং মানুষ পারকিনসন্স, আলঝেইমারস প্রভৃতি শিরাঘটিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে দেশে একটি বিকলাঙ্গ ও অকেজো প্রজন্ম সৃষ্টি হ'তে পারে। শুধু মানুষ নয়, টাওয়ারের বিকিরণের ফলে পশু-পক্ষী ও জীবজগতের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। নারিকেল গাছের ফলন কমে যাচ্ছে। অকালে নারিকেল ঝরে পড়ছে। অধিকাংশ ডাব-নারিকেলে পানি নেই।

এইসব রোগের বাহ্যিক লক্ষণ হ'ল শরীরে ঝিম ঝিম ভাব হওয়া, অবসাদ, বিষণ্নতা, অহেতুক ভয় করা এবং কাজে অমনোযোগী হওয়া, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া। অধিক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীগণ ইতিমধ্যেই এসব রোগে ভুগতে শুরু করেছেন। মোবাইল ব্যবহারের ফলে দেশের অগণিত শিশু এখন 'অটিজমে' (মানসিক প্রতিবন্ধী) আক্রান্ত হচ্ছে। এতে পরিবার, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমেই এক দারুণ অরাজকতা। দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে।

সতর্কতা : (১) কর্ডলেস ফোন ও মোবাইলের ব্যবহার কমিয়ে দিন। ল্যাণ্ডফোন ব্যবহার করুন। কেননা তারযুক্ত হওয়ায় এটি অনেকটা নিরাপদ। (২) একটানা ৬ মিনিটের বেশী মোবাইল ফোনে কথা বলবেন না। তাতে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হতে পারে। (৩) মোবাইল ফোন শিশুদের থেকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরে রাখুন এবং রাতে ঘুমানোর সময় কমপক্ষে ৭ ফুট দূরে রাখুন (৪) কাছে বা বালিশের নীচে রেখে ঘুমাবেন না। এর নীরব রেডিয়েশন তার ঘুমন্ত মালিককে হত্যা করবে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি মোবাইল ফোন এক একটি মৃত্যুদূত সমতুল্য। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসব ক্ষতি বুঝতে পেরেই আমেরিকা সহ উন্নত দেশগুলি ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে এবং তারা এখন এগুলি তৃতীয় বিশ্বে চালান করে দিচ্ছে। আর এটাই তাদের চিরন্তন বদস্বভাব। অথচ বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার হু হু করে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে যার গ্রাহক সংখ্যা ৫ কোটিরও অধিক।

সুফারিশ : (১) লোকালয় থেকে দূরে বহুদূরে টাওয়ার স্থাপন করতে হবে। যার উচ্চতা কমপক্ষে ৪০ তলা বিল্ডিংয়ের সমান হবে। যা ভূমি থেকেই কেবল উক্ত উদ্দেশ্যে স্থাপিত হবে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে। (২) টাওয়ারের রেডিয়েশন মাত্রা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হতে হবে। যা মনিটরিং করার মতো নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনবল মোবাইল কোম্পানীগুলির থাকতে হবে। অথচ এরূপ কোন মেশিন ও যন্ত্রপাতি কোম্পানীগুলির দূরে থাক, খোদ সরকারি বিটিআরসি-র কাছেই নেই। (৩) মোবাইল ফোন ব্যবহারে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে এবং টাওয়ার বসানোর ব্যাপারে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (৪) টাওয়ার বিহীন মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালুর ব্যাপারে কোম্পানীগুলিকে বাধ্য করতে হবে। (৫) নীরব ঘাতক এইসব টাওয়ার স্থাপনের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং যেসব টাওয়ার বসানো হয়ে গেছে, সেগুলি দ্রুত সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- *(আমীন! (স.স.)*।

হে মানুষ! আল্লাহকে লজ্জা কর

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর সত্যিকারের লজ্জা। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা অবশ্যই আল্লাহকে লজ্জা করি- *আলহামদুলিল্লাহ*। তিনি বললেন, কথা সেটা নয়। বরং আল্লাহকে যথার্থভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, (১) তুমি তোমার মাথা ও যেগুলিকে সে জমা করে, তার হেফাযত কর। (২) তুমি তোমার পেট ও যেগুলিকে সে জমা করে, তার হেফাযত কর। (৩) আর তোমার বারবার স্মরণ করা উচিৎ মৃত্যুকে ও তার পরে পচে-গলে যাওয়াকে। (৪) আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে, সে যেন পার্থিব বিলাসিতা পরিহার করে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত কাজগুলি করে, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে লজ্জা করে'।[১]

ব্যাখ্যা :

'তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর' অর্থ আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর ও শ্রদ্ধা কর। অর্থাৎ তার শাস্তির ভয়ে নয় কিংবা কিছু পাওয়ার আশায় নয়। বরং তার বড়ত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদাকে সম্মান কর। তিনি তোমার সব কথা শুনছেন। অতএব এমন কথা বলো না, যাতে তিনি কষ্ট পান ও তিনি অসম্মানিত বোধ করেন। তুমি তোমার গুরুজনের সামনে অনেক কথা বলতে লজ্জা পাও। লোকজনের সামনে অনেক কথা বলতে ভয় পাও। কেউ শুনে ফেলবে সেই ভয়ে অনেক কথা চেপে যাও। তাহ'লে কি তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করবে না, যিনি তোমার গোপন কথা শোনেন ও মনের কথা জানেন? লোকলজ্জার ভয়ে কিংবা ধরা পড়ার আশংকায় তুমি প্রকাশ্যে কোন মন্দকর্ম করো না। অথচ গোপনে বা অন্ধকারে তুমি সেই কাজ করছ। কারণ মানুষ দেখছে না। অথচ আল্লাহ সবই দেখছেন। অতএব তুমি যেমন মানুষ থেকে লজ্জা পাও, তেমনি আল্লাহকে লজ্জা কর। তাঁর চোখের আড়ালে তুমি কিছুই করতে পারবে না। তুমি সর্বদা তাঁর চোখের সামনে রয়েছ। অতএব মনিবের সামনে চাকর যেভাবে কাজ করে, তুমি সেভাবে ভীত ও সতর্কভাবে কাজকর্ম কর।

লজ্জা তিন প্রকার : নিজেকে লজ্জা, মানুষকে লজ্জা ও আল্লাহকে লজ্জা। প্রথম প্রকারের লজ্জা থেকে মানুষ বেপরওয়া। সে গোপনে ও একাকী যা ইচ্ছা তাই করে। অথচ সে জানেনা যে, অনেকগুলি অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী সর্বদা তার সাথে রয়েছে। যাদেরকে বাদ দিয়ে সে কিছুই করতে পারে না। ঐ সাক্ষীগুলি হ'ল তার দেহচর্ম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'আজ আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। আর তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। তিনি আরও বলেন,

حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ- وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

'আল্লাহ্র শত্রুরা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও দেহচর্ম তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'তখন তারা তাদের দেহচর্মকে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন'। তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না... এ ধারণা থেকেই তোমরা তাদের কাছে কোন কিছু গোপন করতে না। আর তোমরা মনে করতে যে তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না'। 'অথচ তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ' *(হামীম সাজদাহ ৪১/২০-২৩)*।

গোপনে মন্দকর্ম করার সময় দ্বিতীয় সাক্ষী থাকেন 'আল্লাহ'। যিনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সব খবর রাখেন। অতএব কোন কাজ করার সময় নিজের অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীগুলি থেকে যেমন সাবধান থাকতে হবে, তেমনি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ থেকে লজ্জিত হতে হবে।

সাঈদ বিন ইয়াযীদ আল-আযদী (রাঃ) বলেন, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

১. *আহমাদ হা/৩৬৭১; তিরমিযী হা/২৪৫৮, মিশকাত হা/১৬০৮, সনদ হাসান 'জানায়েয' অধ্যায় 'মৃত্যু কামনা' অনুচ্ছেদ।*

তিনি বললেন, أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَأَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلاً صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ 'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি এই মর্মে যে, তুমি তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহকে লজ্জা কর, যেমন তুমি তোমার কওমের পুণ্যবান ব্যক্তিকে লজ্জা করে থাক'।[২]

নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ। কেননা একজন দুষ্ট লোক সর্বদা পুণ্যবান ও সৎকর্মশীল জ্ঞানী-গুণী লোকদের সামনে প্রকাশ্য ভাবে কোন অন্যায় কর্ম করতে লজ্জা পায়। তাহলে যিনি তার ভিতর-বাহির সব খবর রাখেন, যিনি সর্বদা তার সম্মুখে আছেন, তাকে কেন মানুষ লজ্জা করবে না? আর এটাই স্বাভাবিক যে যিনি যত নিকটে থাকেন, মানুষ তাকে তত বেশী লজ্জা পায়। তাহলে আল্লাহ্র চাইতে নিকটে আর কে আছে? আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ– 'আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মনের মধ্যে যে কুচিন্তা আসে সেটাও আমরা জানি। আর তার গর্দানের মূল শিরা থেকেও আমরা তার নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

তবে যেসব কাজে আল্লাহ পর্দা করতে বা লজ্জা করতে নিষেধ করেননি, সেসব কাজে আল্লাহকে লজ্জা করার প্রয়োজন নেই। যেমন মু'আবিয়া বিন হায়দাহ আল-কুশায়রী (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, يَا نَبِيَّ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের এমন কিছু লজ্জার বিষয় রয়েছে যা আমরা করি এবং যা আমরা ছাড়ি না। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ 'তুমি তোমার লজ্জাস্থানের হেফাযত কর। তবে তোমার স্ত্রী অথবা দাসী ব্যতীত' ... হাদীছের শেষাংশে তিনি বলেন, فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ 'মানুষের চাইতে আল্লাহ অধিকতর লজ্জার যোগ্য'।[৩] অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে ও তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সর্বাবস্থায় তাঁকে লজ্জা কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত হও।

বিগত দিনে বৃষ্টি বিঘ্নিত ঘনঘটাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পাহাড়ের গুহায় আটকে যাওয়া তিন যুবকের যে কাহিনী হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে একজন ছিল সেই যুবক, যে তার প্রেমিকার সঙ্গে কুকর্মে উদ্যত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রেমিকার মুখ থেকে শুনেছিল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ 'হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর'! ব্যস তাতেই সে বিরত হয়। সেদিন সে আল্লাহকে লজ্জা করেছিল। তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্র হুকুমে গুহার মুখ থেকে বিশাল পাথরটি সরে যায় এবং তারা সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়।[৪]

মানুষ সর্বদা তার চাইতে বড় ব্যক্তি থেকে লজ্জা পায়। অথচ অন্যদেরকে লজ্জা পায় না। সে শিশুদেরকে লজ্জা পায় না। কেননা অবুঝ শিশু কিছু বুঝে না। সে পাগলকে লজ্জা পায় না। কেননা সেও কিছু বুঝে না বা তার সাক্ষ্য কেউ বিশ্বাস করে না। সে পশুকেও লজ্জা পায় না। কেননা ওরা বাকশক্তিহীন এবং তারাও কিছু বুঝে না বা কিছু বুঝলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না। মানুষ মূর্খ থেকে জ্ঞানীকে বেশী লজ্জা পায় এবং একজনের চাইতে অধিক জনকে বেশী লজ্জা পায়। সে সাধারণ লোকদের চাইতে প্রশাসনের লোকদের বেশী ভয় পায়। এমতাবস্থায় সকল জ্ঞানীর বড় জ্ঞানী, সকল শাসকের বড় শাসক আল্লাহকে সে কেন ভয় পায় না? কেন আল্লাহ্র চোখের সামনে পাপ কাজে সে লজ্জা পায় না? অথচ তিনিই লজ্জা পাওয়ার অধিক হকদার!

চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা :

হাদীছে বর্ণিত চারটি কাজকে আল্লাহকে লজ্জা করার প্রধান বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল মাথা ও তাতে সঞ্চিত বিষয়গুলির হেফাযত করা। এর স্থূল ও আধ্যাত্মিক দু'টি দিক রয়েছে। স্থূল দিকটি হ'ল, মাথার সাথে যুক্ত চুল, কান, চোখ, নাক-মুখ ইত্যাদি। যেগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও যত্ন করার মাধ্যমে হেফাযত করা আবশ্যক। যেভাবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিকটি হ'ল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। এর অর্থ হ'ল মাথাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সিজদাবনত না করা। মাথা ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত না করা। মাথার মধ্যে রিয়া, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি রোগ-ব্যাধি লালন না করা। বরং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, সে কাজে মাথা ও তার সকল প্রত্যঙ্গ ও চিন্তাশক্তিকে নিয়োজিত করা।

মুখে কথা বলার সময় ভেবে দেখ এটা মিথ্যা, গীবত বা অপবাদ হচ্ছে কি-না, চোখে কিছু দেখার সময় ভেবে দেখ তাতে তোমার কোন কল্যাণ আছে কি-না, হাতে কাজ করার সময় দেখ তাতে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় হচ্ছে কি-না। চিন্তা করার সময় ভাব সেটা কুচিন্তা হচ্ছে কি-না। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 'যে বিষয়ে তুমি জানো না, সে বিষয়ের পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ, হৃদয় সবকিছুই জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

(২) পেট ও তার মধ্যেকার সবকিছুকে হেফাযত করা। এর অর্থ পেটে হারাম খাদ্য সঞ্চিত না করা। পেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হৃদয়, হাত-পা, গুপ্তাঙ্গ সবগুলিকে অন্যায় কর্ম থেকে

২. *ত্বাবারাণী কাবীর, বায়হাক্বী শু'আব হা/৭৭৩৮; ছহীহাহ হা/৭৪১।*
৩. *তিরমিযী হা/২৭৯৪; আবু দাঊদ হা/৪০১৭ প্রভৃতি।*
৪. *বুখারী হা/২৩৩৩, মুসলিম হা/২৭৪৩, মিশকাত হা/৪৯৩৮।*

হেফাযত করা এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে নিয়োজিত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি তার দু'টি অঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব। তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ, অর্থাৎ জিহ্বা এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ, অর্থাৎ লজ্জাস্থান।[৫]

(৩) মৃত্যুকে ও তার পরবর্তী পচে-গলে যাওয়া অবস্থাকে স্মরণ করা। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শক্তি মদমত্ত মানুষ সাধারণতঃ শয়তানের সাথী হয় এবং সে আল্লাহকে লজ্জা পায় না। সে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। সেকারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুকে (অর্থাৎ মৃত্যুকে) বেশী বেশী স্মরণ কর'।[৬] একই কারণে মুসলমানকে জানাযায় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যাতে ঐ দৃশ্য দেখে নিজের মৃত্যুদৃশ্য স্মরণ হয়[৭] এবং সে পাপ থেকে বিরত হয়। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বিচক্ষণ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ 'যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে'।[৮]

(৪) যে ব্যক্তি আখেরাতকে কামনা করে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার চাকচিক্য পরিহার করে'। অর্থাৎ দুনিয়ার বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েশ, অর্জন-বিয়োজন ভুলে গিয়ে সবকিছুর উপর পরকালীন জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেকারণ অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا- فَأَضِرُّوْا بِالْفَانِي لِلْبَاقِيْ- 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী বস্তুকে পাওয়ার জন্য ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত কর।[৯]

তবে এর অর্থ একেবারেই দুনিয়া পরিত্যাগ করা নয়। বরং এর অর্থ হ'ল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও বিলাসিতা পরিহার করা। আল্লাহ বলেন, لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا 'তুমি তোমার পার্থিব অংশ ভোগ করতে ভুলো না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি দুনিয়াতে থাক একজন আগন্তুক বা একজন মুসাফিরের মত' এবং 'নিজেকে কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর'।[১০]

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় দো'আ পড়তেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'।[১১]

অতএব আলোচ্য হাদীছে দুনিয়াকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং অধিক দুনিয়াবী চাকচিক্য ও বিলাসিতাকে পরিহার করতে বলা হয়েছে এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।

দুনিয়া ও আখেরাত দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক আবাসস্থল। দুনিয়া হ'ল লোভনীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু। যে ব্যক্তি দুনিয়ার লোভে আটকে যাবে, সে ব্যক্তি আখেরাত হারাবে। অতএব জৈবিক ও মানবিক চাহিদা অনুযায়ী যতটুক প্রয়োজন, ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এর বাইরে সর্বদা আখেরাতের সঞ্চয় বৃদ্ধির কাজে লিপ্ত থাকতে হবে। যিনি যত বেশী আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবেন, তিনি তত বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হবেন এবং তার প্রতি আল্লাহ তত বেশী খুশী হবেন। কিন্তু যে তার বিপরীত করবে, আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হবেন। অতএব আল্লাহ থেকে সাবধান! সর্বদা তাকে লজ্জা কর!

মুরব্বীকে দেখে যেমন মানুষ জড়সড় হয়, গুরুজন দেখবেন ভেবে নিজেকে লুকায়, তেমনি আল্লাহ দেখছেন ভেবে কি মানুষ লজ্জিত হবে না? তাই আল্লাহ্র পথে বাধা দানকারীকে এবং আত্মভোলা মানুষকে ধমক দিয়ে আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى 'সে কি জানে না যে আল্লাহ তাকে দেখছেন? *(আলাক্ব ৯৬/১৪)*।

মানুষ যখন কোন পাপ করতে চায়, তখন তা অন্যকে লুকিয়ে করে বা অন্ধকারে যেয়ে করে। অথচ আল্লাহ্র কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না। তাই কবি বলেন,

وَإِذا خَلَوتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلمَةٍ + وَالنَفسُ داعِيَةٌ إِلى الطُغيانِ

فَاستَحي مِن نَظَرِ الإِلَهِ وَقُل لَها + إِنَّ الَّذي خَلَقَ الظَلامَ يَرانِي

'যখন তুমি অস্থির হয়ে অন্ধকারে লুকাবে, অথচ প্রবৃত্তি সর্বদা অবাধ্যতার দিকে আহ্বানকারী'। 'তখন তুমি আল্লাহ্র দৃষ্টি থেকে লজ্জিত হও এবং প্রবৃত্তিকে বল, নিশ্চয়ই যিনি অন্ধকারকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দেখছেন'।

---

৫. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*
৬. *তিরমিযী হা২৩০৭, মিশকাত হা/১৬০৭।*
৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৯।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।*
৯. আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৮৭।
১০. *বুখারী হা/৬৪১৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/৫২৭৪।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৭।*

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করতে চায়, সে যেন তার যমীনের উপর তা না করে। তার দেওয়া খাদ্য ভক্ষণ না করে, তার দেওয়া আলো-বাতাস গ্রহণ না করেও তার সৃষ্ট আকাশের নীচে বসবাস না করে। কেননা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে, সে কোন লজ্জায় তার যমীনে বসবাস করে? তার দেওয়া খাদ্য ভক্ষণ করে? তার দেওয়া পানি পান করে? তার সৃষ্ট বায়ু সেবন করে? সে কিভাবে আল্লাহ্র দেওয়া অমূল্য নে'মত তার চক্ষু দিয়ে দর্শন করে ও কান দিয়ে শ্রবণ করে? ঐ শোন আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ- ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ 'তোমাদের কাছে যেসব নে'মত রয়েছে, সবই আল্লাহ্র দেওয়া। অতঃপর যখন তোমরা কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই কাছে কান্নাকাটি কর'। 'আবার যখন আল্লাহ কষ্ট দূর করে দেন, তখন তোমাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে অন্যকে শরীক করে' *(নাহল ১৬/৫৩-৫৪)*।

আমরা আল্লাহ্র নিকট তাঁকে লজ্জা করার তাওফীক কামনা করছি এবং যে কাজ তিনি ভালবাসেন ও যে কাজে তিনি খুশী হন, তা করার শক্তি প্রার্থনা করছি।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'হায়া' (الْحَيَاء) অর্থ শরম, বৃষ্টি, তরতাযা ইত্যাদি, যা 'হায়াত' (الْحَيَاة) মাছদার হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ হ'ল 'জীবন'। এজন্য বৃষ্টি (الغَيْثُ)-কে জীবন বলা হয়। কেননা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই মৃত যমীন জীবিত হয় ও সেখানে ঘাস ও উদ্ভিদ সমূহের জন্ম হয়। আর 'হায়াত' (الحَيَاة) বললে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন (حَيَاة الدُّنْيَا والآخِرَة)-কে বুঝানো হয়। অতএব যার 'হায়া' অর্থাৎ লজ্জা নেই, সে দুনিয়াতে মৃত এবং আখেরাতে হতভাগ্য (مَيِّتٌ فِي الدُّنْيَا وَشَقِيٌّ فِي الآخِرَةِ)। ... অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার সময় তাকে লজ্জা করে, আখেরাতে সাক্ষাতকালে আল্লাহ তাকে শাস্তিদানে লজ্জাবোধ করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লজ্জাবোধ করে না, আল্লাহ তাকে শাস্তিদানে লজ্জাবোধ করবেন না।[১২]

সারকথা : হাদীছটির সারকথা এই যে, মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরা দেহ যন্ত্রটির ভিতর ও বাহির মন্দের খনি ও অপরাধপ্রবণ। চুম্বক খণ্ডের মত সে দ্রুত অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখনই আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয় বা তাকে স্মরণ করানো হয়, তখনই সে ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় এবং সরল পথে ফিরে আসে। অতএব সবাইকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে লজ্জা করা উচিৎ।

আল্লাহ বলেন, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 'তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলো তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ন্যায়। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী তাকে সেটা দান করে থাকেন। আর আল্লাহ মহান করুণার অধিকারী' *(হাদীদ ৫৭/২১)*।

অতএব আসুন! আমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে লজ্জা করি এবং তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত লাভে প্রতিযোগিতা করি- আমীন!

১২. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা 'আনিদ দাওয়াইশ শাফী, মরক্কো : দারুল মা'রেফাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃঃ ৬৯।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীরে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

[মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি (জন্ম : ১৫ই মার্চ ১৯২৫) পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও আহলেহাদীছ ঐতিহ্যের শেকড়সন্ধানী গবেষক। এই কলমসৈনিক আহলেহাদীছ মনীষীদের জীবনী ও আহলেহাদীছ ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অবিরাম লিখে চলেছেন। সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে এ সম্পর্কে এতো বেশী কেউ লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সঙ্গতকারণেই তিনি 'মুওয়াররিখে আহলেহাদীছ' (আহলেহাদীছদের ঐতিহাসিক) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী আওয়ালিয়্যাত' এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর, হাদীছের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, বাহাছ-মুনাযারা, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আরবী সাহিত্য চর্চা, উর্দূ থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ, কুরআন ও হাদীছের হিন্দী অনুবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছদের অগ্রণী ভূমিকাই এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী এতদ্বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ (মূল উর্দূ গ্রন্থের ভূমিকা পৃঃ ২৭ দ্র.)। যারা বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের কোন অবদান নেই- এই গ্রন্থের প্রতিটি লাইন তাদেরকে নির্বাক করে দিবে। আমরা 'আত-তাহরীক'-এর পাঠকদের খিদমতে পর্যায়ক্রমে প্রবন্ধাকারে এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির অনুবাদ পেশ করব ইনশাআল্লাহ। আশা করি বিদগ্ধ পাঠক আহলেহাদীছদের কৃতিত্বের স্মারক অনেক অজানা ইতিহাস জেনে ঋদ্ধ হবেন।-অনুবাদক]

এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি দেশকে (পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ) একসাথে 'বার্রে ছাগীর' (উপমহাদেশ) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই তিনটি দেশ অসংখ্য মাযহাবের চিত্তাকর্ষক স্থান। এখানে প্রত্যেক মাযহাবের লোকজন নিজ নিজ তরীকা অনুযায়ী ইবাদত করার ব্যাপারে স্বাধীন। এ উপমহাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ২৫ কোটির মতো ভারতে, ২০ কোটির কাছাকাছি বাংলাদেশে এবং ১৮ কোটি মুসলমান পাকিস্তানে বসবাস করছে। মুসলমানদের মধ্যে আহলেহাদীছ, হানাফী (দেওবন্দী, ব্রেলভী), মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী, শী'আ সব মাযহাবের মানুষই শামিল আছে এবং নিজেদের আক্বীদা ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আমি এই প্রবন্ধে আহলেহাদীছদের খিদমত সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাচ্ছি এবং বলতে চাচ্ছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে জ্ঞান-গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় তাদের কী কী অগ্রগণ্য কৃতিত্ব রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

* পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সর্বাগ্রে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তাদের অবদান আলোচনা করছি এবং এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে এই হেদায়াতের গ্রন্থের অনুবাদ ও তাফসীরে আহলেহাদীছ আলেমগণ কী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তাদের কী অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট করার পূর্বে সামান্য ভূমিকা।

কুরআন মাজীদের তাফসীরের সূচনা :

ছাহাবীদের যুগে আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদের তাফসীরের সূচনা হয়। সূচনালগ্নে সংক্ষিপ্তাকারে তাফসীর করা হ'ত। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অসংখ্য বড় বড় তাফসীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ফার্সীই প্রথম অনারব ভাষা যাতে ছাহাবীদের যুগে কুরআন মাজীদ অনুবাদের সিলসিলা শুরু হয়েছিল। আল্লামা সারাখসীর অভিমত হল হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) পারস্যবাসীদের জন্য প্রথম সূরা ফাতিহার ফার্সী অনুবাদ করেন।[১৩] তবে ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন মাজীদের কিছু সূরার (যেমন সূরা ইয়াসীন) সর্বপ্রথম অনুবাদ সিন্ধী ভাষায় হয়।[১৪]

শায়খ শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃঃ ৮৪৯ হিঃ/১৪৪৫ খ্রিঃ) 'বাহরে মাওওয়াজ' (بحر موّاج) নামে ফার্সী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন ও তাফসীর লিখেন। কিন্তু এটা কুরআনের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ ও তাফসীর ছিল। পুরা কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর ছিল না।

শায়খ আলী মুত্তাকী (মৃঃ ২রা জুমাদাল উলা ৯৭৫ হিঃ/৪ঠা নভেম্বর ১৫৮৭ খ্রিঃ) উপমহাদেশের অনেক বড় আলেম ও লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর 'শুউনুল মুনাযালাত' (شئون المنزلات) গ্রন্থে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও স্থান উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে কিছু শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থটি পুরা কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের মর্যাদা লাভ করেনি।

ভারতবর্ষের চতুর্থ মোগল বাদশাহ নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর গুজরাটের কাঠিওয়াড়ের মুহাম্মাদ বিন জালালুদ্দীন হাসানী গুজরাটী নামের এক আলেমকে কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, শাব্দিক ও বোধগম্য অনুবাদ হ'তে হবে। অনুবাদের কোন শব্দ যেন কুরআনের শব্দের চেয়ে বেশী না হয়।[১৫] বাদশাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক অনুবাদ হয়েছিল কি-না তা জানা যায় না। যদি হয়েই থাকে তাহলে এই অনুবাদ কোথাও মওজুদ আছে, না নাই? আমাদের জানা মতে এই অনুবাদটি কোথাও নেই।

১৩. *আল-মাবসূত (১/৩৭, মিসরীয় ছাপা)-এর বরাতে মুওয়াযিহুল কুরআন-এর টীকা, পৃঃ ১২।*
১৪. *বিস্তারিত দেখুন : ফুকাহায়ে হিন্দ ১/৮৯-৯১।*
১৫. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৫/১২১।*

ভূমিকামূলক একথাটুকুর পর এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে যে, উপমহাদেশে পুরা কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর সর্বপ্রথম কোন আলেমগণ করেছিলেন। আর সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছিল এবং অদ্যাবধি প্রকাশনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষেরা সীমাহীন উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।-

কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ :

শায়খ নূহ বিন নে'মতুল্লাহ সিন্ধী ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আলেম, যিনি পুরা কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ করেন ও তাফসীর লিখেন। তিনি সিন্ধু প্রদেশের হালাকান্দী গ্রামের বাসিন্দা এবং সমকালীন খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তিনি ৯৯৮ হিজরীর ২৬শে যুলকা'দায় (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৯০ খ্রিঃ) স্বীয় বাসস্থান হালাকান্দীতে মৃত্যুবরণ করেন। পনেরশত হিজরী উপলক্ষে ১৪০১ হিজরীতে এই ফার্সী অনুবাদটি সিন্ধী সাহিত্য পরিষদ, হায়দারাবাদ, জামশুরু (সিন্ধু) প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ফার্সী অনুবাদক হলেন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের নাম 'ফাতহুর রহমান' (فتح الرحمن)।[১৬] উপমহাদেশের অগণিত প্রকাশক অসংখ্যবার এই অনুবাদটি প্রকাশ করেছে। ওলামায়ে কেরামের মাঝে এটি দারুণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং বহুলপঠিত হয়েছে। উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এটাকে বিশুদ্ধতম অনুবাদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং সর্বশ্রেণীর আলেমগণ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

উপমহাদেশে উছূলে তাফসীর বিষয়েও 'আল-ফাওযুল কাবীর' নামে ফার্সী ভাষায় শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীই সর্বপ্রথম গ্রন্থ লিখেন।[১৭] এই গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই অধ্যায় সমূহে শরী'আতের বিধি-বিধান, মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদী ও নাছারাদের সাথে বিতর্ক, আল্লাহ্র নে'মত সমূহ, ঘটনাসমূহ, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যা, সূরা সমূহ অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে শাহ ছাহেব বলেন, যখন এই ফকীরের (অলিউল্লাহ) জন্য আল্লাহ কুরআন মাজীদ অনুধাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তখন মনের মধ্যে এই ইচ্ছা জাগল যে, কিছু উপকারী এমন সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করব যা কুরআন মাজীদ অনুধাবন ও গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষদের জন্য উপকারী বিবেচিত হবে। মূলতঃ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শাহ ছাহেবের আরবী ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'ফাতহুল খাবীর' (فتح الخبير)। এটি কুরআন মাজীদের কঠিন ও বিরল শব্দের ব্যাখ্যা। এতে ঐ সমস্ত প্রায় সকল বিষয় পরিপূর্ণরূপে একত্রিত করা হয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এটিও উপমহাদেশের এই মহান লেখকের এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ। তিনি ১১১৪ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৭০৩ খ্রিঃ) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭২ হিজরীর ২৯শে মুহাররম (২০শে আগস্ট ১৭৬২ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

শাহ অলিউল্লাহ্র পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী 'তাফসীরে ফাতহুল আযীয' নামে ফার্সীতে কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেছেন। যেটি 'তাফসীরে আযীযী' (تفسير عزيزى) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের গণ্ডগোলের সময় হারিয়ে গেছে। স্রেফ ১ম ও শেষ খণ্ড দু'টি অবশিষ্ট রয়ে গেছে।[১৮] প্রথম খণ্ডটি সূরা ফাতেহা থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত সোয়া দুই পারার এবং অন্য খণ্ডটি শেষ দুই পারার (ঊনত্রিশ ও ত্রিশ) তাফসীরকে শামিল করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ফার্সী ভাষায় এটিই প্রথম বিস্তারিত তাফসীর ছিল। দুঃখের বিষয় হ'ল এটি কালের লুটতরাজের শিকার হয়েছে। শাহ আব্দুল আযীযের এই কুরআনী খিদমত ছাড়াও তাঁর এক ছাত্র তাঁর দরসে কুরআনকে লিপিবদ্ধ করে সূরা মুমিনূন থেকে সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ পারার তাফসীর সংকলন করেছেন।[১৯] যা 'পাঞ্জে পারা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শাহ আব্দুল আযীয ১১৫৯ হিজরীর ২২শে রামাযানে (২৭শে নভেম্বর ১৭৪৬) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯ বছর বয়সে ১২৩৮ হিজরীর ৭ই শাওয়ালে (১৭ই জুলাই ১৮২৩) দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে এত লোক সমাগম হয়েছিল যে, ৫৫ বার তাঁর জানাযা পড়া হয়। এটাও সম্ভবত উপমহাদেশের এক আহলেহাদীছ আলেমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আমার জানা নেই যে, এর পূর্বে বা পরে কোন আলেমের জানাযা এতবার পড়া হয়েছে।

উপমহাদেশে পাঞ্জাব প্রদেশের যেই আলেম পুরা কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ করেন তিনি হলেন হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী। ধারাবাহিকতার দিক থেকে হাফেয ছাহেব

---

১৬. *এই অনুবাদ করার অপরাধে (!) দিল্লীর দুষ্ট আলেমরা তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যার ফৎওয়া জারি করে এবং লোকজনকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় (দ্র. ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খ্রিঃ), পৃঃ ১১, আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৪৬)।-অনুবাদক*

১৭. *আযহারী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী এটিকে আরবীতে রূপান্তর করেন। তবে চতুর্থ অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদ المقطعات القرآنية বা 'কুরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ' অংশটুকুর আরবী অনুবাদ করেন মাওলানা ই'যায আলী দেওবন্দী (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৭)।-অনুবাদক*

১৮. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/২৭৩।*

১৯. *শাহ আব্দুল আযীযের ছাত্র রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী 'আল-ইফাদাত আল-আযীযিয়া ওয়াত তাহকীকাত আন-নাফীসাহ' নামে এটি সংকলন করেন (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ১৩)।-অনুবাদক*

উপমহাদেশে কুরআন মাজীদের তৃতীয় ফার্সী অনুবাদক ও মুফাসসির। 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' (تفسير محمدي) নামে তিনি এই খিদমত আঞ্জাম দেন। এটি বড় সাইজের আড়াই হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী। ১২৮৬ হিজরীতে তিনি এই তাফসীর লিখা শুরু করেন এবং ১২৯৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে তা সমাপ্ত হয়। পুরা দশ বছর (১৮৬৯-১৮৭৯ খ্রিঃ) তিনি এই কল্যাণকর কাজে নিমগ্ন ছিলেন।

হাফেয লাক্ষাবীর রচনা পদ্ধতি ছিল এরূপ- তিনি প্রথমে কুরআন মাজীদের আয়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার নীচে পাঞ্জাবী অনুবাদ এবং তার নীচে ফার্সী অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সেটিকে শাহ অলিউল্লাহ্র অনুবাদ বলে আখ্যা দিতেন। অথচ সবাই জানে যে, শব্দের পরিবর্তনের নামই অনুবাদ। একটি অনুবাদের শব্দ পরিবর্তনের ফলে আরেকটি অনুবাদের মর্যাদা লাভ করেছে। যেকোন ভাষায় যত অনুবাদ হয়েছে তা সব শাব্দিক পরিবর্তনেরই ফসল। শাহ ছাহেবের অনুবাদের শাব্দিক পরিবর্তনের ফলে তা হাফেয লাক্ষাবীর অনুবাদে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সেটিকে নিজের (ফার্সী) অনুবাদ বলে দাবী করতেন না; বরং শাহ ছাহেবের অনুবাদ বলে আখ্যা দিতেন। এটা তাঁর নম্রতা বৈকি!

পাঞ্জাবী অনুবাদের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হল, এটা শাহ রফীউদ্দীনের উর্দূ তরজমার পাঞ্জাবী তরজমা। এটাকেও তাঁর নম্রতাই বলা চলে। মূলত ঘটনা এই যে, হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী দুই ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেছেন। একটি ফার্সী এবং একটি পাঞ্জাবী ভাষায়। এভাবে তিনি ভারতবর্ষের তৃতীয় এবং অবিভক্ত পাঞ্জাবের প্রথম আলেম, যিনি কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তিন ধরনের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১. ফার্সী অনুবাদ ২. পাঞ্জাবী অনুবাদ ও ৩. পাঞ্জাবী পদ্যে কুরআনের তাফসীর। যা বড় সাইজের ৭টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং আড়াই হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী।

হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী বর্তমান ভৌগলিক মানচিত্র অনুযায়ী ভারতের ফিরোযপুর (পূর্ব পাঞ্জাব) যেলার ছোট্ট গ্রাম 'লাক্ষৌকে'তে ১২২১ হিজরীর (১৮০৭ খ্রিঃ) কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন এবং উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। পড়াশোনার গভীরতা এত ব্যাপক ছিল যে, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী তাঁকে 'লাইব্রেরী' বলে ডাকতেন। হাফেয মুহাম্মাদের দাদা হাফেয আহমাদ নিজ ছোট্ট গ্রাম 'লাক্ষৌকেতে' 'দারুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা চালু করেছিলেন। হাফেয মুহাম্মাদ ১৮৪০ সালের দিকে এর নাম রাখেন 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া'। যেখানে অসংখ্য আলেম ও ছাত্র জ্ঞানার্জন করেছে। দেশ বিভাগের পর এই মাদরাসাটি 'জামে'আ মুহাম্মাদিয়া' নামে উকাড়াতে স্থানান্তরিত হয়। এর অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ছিলেন হাফেয ছাহেবের প্রপৌত্র মাওলানা মঈনুদ্দীন লাক্ষাবী (মৃঃ ৯ই ডিসেম্বর ২০১১/১৩ই মুহাররম ১৪৩৩ হিঃ)। হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী অনেক গ্রন্থের লেখক ছিলেন। ১৩১১ হিজরীর ছফর মাসের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) তিনি নিজ বাসস্থান লাক্ষৌকেতে ইন্তেকাল করেন।

ফার্সী ভাষায় কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত একটি কাজ জামে'আ দারুল উলূম গাওয়াড়ী (বেলুচিস্তান)-এর হাজী খলীলুর রহমান করেছেন। তিনি ৬২টি ফার্সী কবিতায় কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার পরিচয় বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে এটা এমন একটি কাজ যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তিনি ১৩২৩ হিজরীর ২০শে জুমাদাল আখেরাহ (২২শে আগস্ট ১৯০৫) বেলুচিস্তানের বালগার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৭১ বছর বয়সে ১৩৯৬ হিজরীতে (১৯৭৬ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর :

এবার কুরআন মাজীদের উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর স্বনামধন্য পুত্র শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী কুরআন মাজীদের প্রথম উর্দূ অনুবাদ করেন এবং 'মুওয়ায্যিহুল কুরআন' (موضح القرآن) নামে তাফসীর লিখেন। ১২০৫ হিজরীতে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানী স্বীয় পিতা সাইয়িদ ফখরুদ্দীন হাসানীর কিতাব 'সেপাহর জাহা তাব' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী স্বপ্নে দেখেন তার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বড় ভাই শাহ আব্দুল আযীযের নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। শাহ আব্দুল আযীয বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে অহী অবতীর্ণের সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। তবে নিঃসন্দেহে স্বপ্ন সত্য। তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কুরআন মাজীদের খিদমত করার এমন তৌফিক দান করবেন যা ইতিপূর্বে কারো ভাগ্যে জোটেনি।[২০] বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর 'মুওয়ায্যিহুল কুরআন' লেখার তৌফিক দেন। যার দ্বারা লক্ষ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ উপকৃত হওয়ার এই সিলসিলা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

কোন কোন গবেষক শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীকৃত অনুবাদকে কুরআনের প্রথম উর্দূ অনুবাদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল প্রথম উর্দূ অনুবাদ শাহ আব্দুল কাদের কৃত। যার একটি প্রমাণ তাঁর এই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা।

শাহ আব্দুল কাদের ১১৬৩ বা ১১৬৪ হিজরীতে (১৭৫০ বা ১৭৫১ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩০ হিজরীর ১৯শে রজব (২৭শে জুন ১৮১৫) মৃত্যুবরণ করেন।

উর্দূ ভাষায় কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় অনুবাদ করেন শাহ আব্দুল কাদেরের বড় ভাই শাহ রফীউদ্দীন। শাহ আব্দুল

২০. *নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/২৯৫।*

কাদেরের অনুবাদের মতো এই অনুবাদও দারুণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁর সময় উর্দূ ভাষা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং সেই সময় অন্য কোন ভাষার গ্রন্থকে উর্দূতে রূপান্তর করা খুবই কঠিন ছিল। বিশেষত কুরআন মাজীদের অনুবাদ ছিল খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই বুযুর্গানে দ্বীনকে তৌফিক দেন এবং এই কঠিনতম পর্বের অবসান ঘটে। শাহ রফীউদ্দীন মা'কূলাত ও মানকূলাতে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। কবিতা ও কাব্যচর্চার সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি ১১৬২ হিজরীতে (১৭৪৯ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৩ হিজরীর ৬ই শাওয়াল (৯ই আগস্ট ১৮১৮) ইন্তেকাল করেন।

শাহ রফীউদ্দীনের মৃত্যুর ২২ বছর পর তদীয় কুরআনের অনুবাদ ১২৫২ হিজরীতে (১৮৪০ খ্রিঃ) প্রথমবারের মতো কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর অনেক প্রকাশক একাধিকবার এটি প্রকাশ করেছেন এবং এখনো প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ এটিকে কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে আলাদাভাবে প্রকাশ করেছেন এবং কেউ কেউ অন্য কোন অনুবাদকের অনুবাদের সাথে প্রকাশ করেছেন।

কোন এক সময়ে বড় সাইজে তিনটি অনুবাদ একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[২১] কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে প্রথমত শাহ অলিউল্লাহ্‌র ফার্সী অনুবাদ, দ্বিতীয়ত শাহ রফীউদ্দীনের উর্দূ অনুবাদ এবং তৃতীয়ত শাহ আব্দুল কাদেরের উর্দূ অনুবাদ ছিল। এভাবে তিন পিতা-পুত্রের একত্রিত অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং এটাকে 'তিন তরজমাওয়ালা কুরআন মাজীদ' বলা হত। এই কুরআন মাজীদ আমার দাদার (মিয়াঁ মুহাম্মাদ) নিকট ছিল এবং তিনি প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় কুরআনের ঐ কপিই তেলাওয়াত করতেন।

মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ফার্সী অনুবাদ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী এবং প্রথম উর্দূ অনুবাদ তাঁর পুত্রদ্বয় করেছিলেন। তাঁদের পরে অনেক আলেম কুরআনের অনুবাদ করেছেন। ডেপুটি নাযীর আহমাদ স্বীয় অনূদিত কুরআনের ভূমিকায় লিখছেন-

'যখন এক সাথে একটি বংশের তিন তিনটি অনুবাদ মানুষেরা পেয়ে গেল। একটি শাহ অলিউল্লাহকৃত ফার্সী অনুবাদ এবং শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীন কৃত দু'দুটি উর্দূ অনুবাদ, তখন সবার অনুবাদ করার সাহস সৃষ্টি হল। কিন্তু অলিউল্লাহ পরিবার ছাড়া কোন ব্যক্তি কুরআনের অনুবাদক হওয়ার দাবী করতে পারে না। তারা কস্মিনকালেও কুরআনের অনুবাদক নন; বরং শাহ অলিউল্লাহ ও তাঁর পুত্রদের অনুবাদের অনুবাদক। তারা তাদের অনুবাদে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আগপিছ করে নতুন অনুবাদের নাম দিয়ে দিয়েছে'।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের কুরআনী খিদমত :

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভারতীয় উপমহাদেশের বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই লিখেছেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, আক্বাইদ, কবিতা ও কাব্যচর্চা, সাহিত্য, নৈতিকতা, তাছাওউফ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিরোনামে ৩২৩টি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধুমাত্র কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর ৭টি গ্রন্থ আছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. ফাতহুল বায়ান ফী মাকাছিদিল কুরআন : এটি আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদের তাফসীর। প্রথমে এটি ৪ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং নওয়াব ছাহেবের জীবদ্দশাতেই ভূপালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হওয়ার পর নওয়াব ছাহেব এর বিভিন্ন জায়গায় বহু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। ফলে এ তাফসীরের পরিধি গিয়ে দাঁড়ায় ১০ খণ্ডে। অতঃপর নিজেই এটিকে মিসর থেকে ছাপান। এটি বড় সাইজের চার হাযার পৃষ্ঠার অধিক।

২. তারজুমানুল কুরআন বিলাতায়িফিল বায়ান : এই তাফসীরটি উর্দূ ভাষায় রচিত ও ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত।

৩. তাযকীরুল কুল বিতাফসীরিল ফাতিহা ও আরবা' কুল : এটি উর্দূ ভাষায় সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূণ, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাসের তাফসীর।

৪. নায়লুল মারাম মিন তাফসীরি আয়াতিল আহকাম : এটি আরবী ভাষায় রচিত এবং কুরআন মাজীদের শারঈ বিধি-বিধান সম্পর্কিত ২৩৬টি আয়াতের তাফসীর।

৫. ফাছলুল খিতাব ফী ফাযলিল কিতাব : এটি উর্দূ ভাষায় রচিত। এতে কুরআন মাজীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে এটি এক অনন্য গ্রন্থ।

৬. ইকসীর ফী উছূলিত তাফসীর : এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ফার্সী ভাষায় রচিত।[২২] প্রথম খণ্ডে তাফসীর গ্রন্থাবলীর পরিচয় পেশ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মুফাসসিরদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের একজন আহলেহাদীছ লেখক রচিত এ বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ।

৭. ইফাদাতুশ শুয়ূখ বিমিকদারিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ : এটিও ফার্সী ভাষায় রচিত এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কুরআনের আয়াত সমূহের নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ

২১. *এই তিনটি অনুবাদের মূল পাণ্ডুলিপি শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভীর নিকট সংরক্ষিত ছিল। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মাওলানা বেলায়াত আলী ছাদেকপুরী তাঁর নিকট উক্ত অনুবাদত্রয় প্রকাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং ইসহাক দেহলভীর ছাত্র রফীউদ্দীন বারদোআনীকে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে রাযী করান। ফলে বারদোআনী ১০ হাযার রূপী দিয়ে একটি নতুন প্রেস ক্রয় করে নিজ খরচে উক্ত অনুবাদ তিনটি প্রকাশ করেন (দ্র. গোলাম রসূল মেহের, জামা'আতে মুজাহিদীন, পৃঃ ২৯৭-৩০১; জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ১৮-১৯) ।-অনুবাদক*

২২. *সাইয়িদ নূরুল হাসান হুসাইনী এটিকে আরবীতে রূপান্তর করেছেন (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ২৪) ।-অনুবাদক*

(রহিত) এবং দ্বিতীয় খণ্ডে হাদীছের নাসিখ-মানসূখ উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন বিষয়ে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের এই ৭টি গ্রন্থের মধ্যে কিছু আরবীতে, কিছু ফার্সীতে এবং কিছু উর্দূতে রচিত। অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কিত বিষয়ে নওয়াব ছাহেব তিন ভাষাতেই লিখেছেন এবং অত্যন্ত গবেষণা করে লিখেছেন। এই ৭টি গ্রন্থ কলেবরের দিক থেকে ১০ হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী। কুরআন সম্পর্কে নওয়াব ছাহেবের এটি বড় খিদমত, যা তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আলেম ছিলেন, যিনি কুরআন মাজীদ সম্পর্কে এত বিস্তারিত লিখেছেন।

নওয়াব ছাহেব ১২৪৮ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল উলাতে (১৩ই নভেম্বর ১৯৩২) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৭ হিজরীর ২৯শে জুমাদাল আখেরায় (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯০) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদীর তাফসীর :

ভারতের ইউপি'র (উত্তর প্রদেশ) বিভিন্ন শহর-নগর ও গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন। যারা সর্বদা নিজেদেরকে জ্ঞান-গবেষণায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এই আলেমদের মধ্যে সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদীর নামও শামিল রয়েছে। যিনি লক্ষ্ণৌ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত মালীহাবাদ নামক এক গ্রামে ১২৭৪ হিজরীতে (১৮৫৮ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' (تفسير مواهب الرحمن) নামে ৩০ খণ্ডে কুরআন মাজীদের ত্রিশ পারার তাফসীর লিখেন। যা প্রথমবার নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়।[২৩] অতঃপর ১০টি বৃহৎ খণ্ডে এটি ছাপানো হয়। এই খণ্ডগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮১২। ইউপির (উত্তর প্রদেশ) তিনিই প্রথম আলেম, যাকে আল্লাহ তা'আলা এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' ছাড়াও ফায়যীর নুকতাবিহীন তাফসীর 'সাওয়াতিউল ইলহাম' (سواطع الإلهام)-এর উপর নুকতাবিহীন ভূমিকা লিখেছেন। তিনিই প্রথম আলেম যিনি এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ করেছেন। 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' ও 'সাওয়াতিউল ইলহাম' দু'টিই নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী ১৩৩৭ হিজরীতে (১৯১৯ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী :

ডেপুটি সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী ১২৫৮ হিজরীতে (১৮৪২ খ্রিঃ) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন এবং গ্রন্থ রচনা ও দ্বীনী খিদমতে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লীর তিনিই প্রথম আলেম, যিনি উর্দূ ভাষায় 'আহসানুত তাফাসীর' (أحسن التفاسير) নামে ৭ খণ্ডে কুরআন মাজীদের তাফসীর লিপিবদ্ধ করেছেন। যা দুই হাযার ৫৬২ পৃষ্ঠা ব্যাপী। সম্মানিত মুফাসসিরের জীবদ্দশায় ১৩২৫ হিজরীতে (১৯০৮ খ্রিঃ) প্রথমবার এটি দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। কুরআন মাজীদের আয়াতের অর্থ শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী কৃত অনুবাদ থেকে গৃহীত।

১৪১৬ হিজরীতে (১৯৯৬ খ্রিঃ) এই তাফসীরটি মাকতাবা সালাফিয়া, শীশমহল রোড, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এতে উল্লিখিত হাদীছগুলোর তাখরীজ করে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীদের নির্ঘণ্ট তৈরী করা হয়েছে। যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত আছে। ডেপুটি সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী প্রায় ৮০ বছর বয়সে ১৩৩৮ হিজরীর ১৮ই জুমাদাল আখেরায় (৯ই মার্চ ১৯২০ খ্রিঃ) এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে স্থায়ী জগতে পাড়ি জমান।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কুরআনী খিদমত :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অবিভক্ত পাঞ্জাবের প্রথম আলেমে দ্বীন, যিনি উর্দূ ভাষায় 'তাফসীরে ছানাঈ' (تفسير ثنائى) নামে পুরা কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেন। এই তাফসীরটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৯৫ সালে (১৩১৩ হিঃ) এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং শেষ খণ্ড ১৯৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে (২৯শে রামাযান ১৩৪৯ হিঃ) সমাপ্ত হয়।[২৪] এতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুফাসসির উপযুক্ত স্থান সমূহে স্বীয় যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (খ্রিস্টান, আর্য সমাজ, কাদিয়ানী, শী'আ, প্রকৃতিবাদী, হাদীছ অস্বীকারকারী প্রভৃতি) সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। অন্য কথায়, মাওলানা তাঁর তাফসীরে নিজস্ব খাছ তার্কিক ধাঁচ বজায় রেখেছেন এবং মানুষদেরকে কুরআনী বিধি-বিধান ও ইসলামের মূলনীতি সমূহ বুঝানোর পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী বিধি-বিধানের উপর আরোপিত অভিযোগ সমূহের জবাব দিয়েছেন।

দেশ বিভাগের পূর্বে মাওলানা অমৃতসরী আরবী ভাষায় দু'টি তাফসীর লিখেন। একটি আরবী তাফসীরের নাম 'তাফসীরুল

২৩. *তিনি নওলকিশোর নামক এক হিন্দু ব্যক্তির অনুরোধে এই তাফসীরটি রচনা করেন। ১৯০২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, উক্ত হিন্দুর নামেই প্রতিষ্ঠিত নওলকিশোর প্রেস ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি এই প্রেস থেকে হাদীছ, ফিকহ ও তাফসীরের শত শত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। মালীহাবাদীর তাফসীরটি ছাপতে পারার কারণে প্রেস মালিক নওলকিশোর গর্ববোধ করতেন। কারণ তার ধারণা এর মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের দারুণ উপকার করেছেন (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৩৫)।-অনুবাদক*

২৪. *এই তাফসীরের ভূমিকায় মাওলানা অমৃতসরী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর তাফসীর প্রকাশিত হওয়ার পর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 'বায়ানুল কুরআন' লিখেন এবং তাঁর তাফসীর দ্বারা প্রভাবিত হন (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪১)।-অনুবাদক*

কুরআন বিকালামির রহমান' (تفسير القرآن بكلام الرحمن) অর্থাৎ কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর। এ বিষয়ে এটি এক অনন্য তাফসীর, যা ১৯০৩ সালে (১৩২১ হিঃ) প্রকাশিত হয়।[২৫] এটি প্রথম আরবী তাফসীর, যা অবিভক্ত পাঞ্জাবের একজন আলেম লিখেন। দ্বিতীয় আরবী তাফসীরের নাম হল 'বায়ানুল ফুরকান আলা ইলমিল বায়ান' (بيان الفرقان على علم البيـــان)। এই তাফসীরটি মাওলানা ইলমে মা'আনী ও বায়ানের (অলংকারশাস্ত্র) আলোকে লিখা শুরু করেছিলেন। এর প্রথম খণ্ড সূরা বাকারায় গিয়ে ঠেকেছিল। এ খণ্ডের শেষে দ্বিতীয় খণ্ড লেখার কথা বলেছিলেন। কিন্তু লেখা হয়নি। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৩৪ সাল (১৩৫৩ হিঃ)। তিনি ১৮৬৮ সালে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ সারগোধাতে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী :

অবিভক্ত পাঞ্জাবে উর্দূ ভাষায় পুরা কুরআন মাজীদের তাফসীর লেখক দ্বিতীয় আহলেহাদীছ আলেম হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী। তাঁর তাফসীরের নাম 'সিরাজুল বায়ান' (ســـراج البيـــان)। এই তাফসীরটি প্রথমবার ১৯৩৪ সালে মুদ্রিত হয়। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে এটি খুবই সুন্দর তাফসীর।

মাওলানা হানীফ নাদভীর কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ১৯২৫-১৯৩০ সাল পর্যন্ত দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌতে জ্ঞানার্জন করা অবস্থায় তিনি কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ সনদ লাভ করেন। তিনি ১৯০৮ সালের ১০শে জুন গুজরানওয়ালাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৭ সালের ১২ই জুলাই লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী :

মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী প্রথম লেখক, যিনি উর্দূ ভাষায় 'জামউল কুরআন ওয়াল হাদীছ' (جمـــع القـــرآن والحديث) নামে গ্রন্থ লিখেন এবং প্রমাণ করেন যে, বর্তমানে যেই ধারাবাহিকতায় কুরআন মাজীদ মওজুদ রয়েছে এবং যেভাবে মানুষ তেলাওয়াত করে, ঠিক সেই ধারাবাহিকতায়-ই নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজীদ সংকলিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর বরকতময় যুগে হাদীছের সংগ্রহ ও সংকলনের সূচনাও ছাহাবীগণ করেছিলেন এবং অসংখ্য হাদীছ সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল। এই গ্রন্থটি প্রথমবার আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ, মসজিদে মুবারক, লাহোর প্রকাশ করেছিল। তিনি ১৩০৭ হিজরীর ১লা শাওয়ালে (২১শে মে ১৮৯০) বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৬৯ হিজরীর ৩রা ছফরে (২৫শে নভেম্বর ১৯৪৯) তাঁর মৃত্যু হয়।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ :

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উপমহাদেশের এমন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের জ্ঞানগত মর্যাদা ও বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে গোটা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কুরআন মাজীদের মাধ্যমেই তিনি নিয়ম মাফিক লেখনী ও বক্তব্যের সূচনা করেছিলেন। এই হেদায়াতের গ্রন্থের সাথে তাঁর সীমাহীন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। 'তারজুমানুল কুরআন' (ترجمان القرآن) নামে তিনি অনুবাদ ও তাফসীর শুরু করেছিলেন। এই তাফসীরটি সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নূরের শেষ পর্যন্ত চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[২৬] দুঃখের বিষয় বাকী পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে গেছে। তাঁর এই তাফসীরের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা, সূরা ইউসুফ ও সূরা কাহফের তাফসীর বেশ বিস্তারিত এবং তাহকীকী দৃষ্টিকোণ থেকে জবরদস্ত তাফসীর। যা পৃথক পৃথকভাবে গ্রন্থকারেও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু উর্দূ ভাষাতেই নয় বরং কোন ভাষাতেই এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী তাফসীর লিখা হয়নি।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উপমহাদেশের প্রথম আলেম, যিনি কুরআন মাজীদের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। 'আমছালুল কুরআন' (কুরআনের উপমাসমূহ) নামেও একটি গ্রন্থ লিখেছেন। উপরন্তু কুরআনের আলোকে তিনি আল-কালিমুত তাইয়িব, আদ-দ্বীনুল খালেছ, আল-বুরহান, কানূনে নশব ওয়া ইরতিকা (বিবর্তনবাদ তত্ত্ব), হাকীকাতে ঈমান, কুফর ওয়া নিফাক, খাছায়িছে মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেগুলো স্ব স্ব

২৫. *এই তাফসীরটি প্রকাশিত হওয়ার পর মিসরের 'আল-আহরাম' ও 'আল-মানার' পত্রিকা দু'টি অমৃতসরীকে ভারতের একজন অন্যতম বড় ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করে। তাছাড়া শিবলী একাডেমী (আযমগড়, ইউপি) থেকে প্রকাশিত 'মা'আরিফ' (উর্দূ) পত্রিকা এটিকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪১-৪২)।- অনুবাদক*

২৬. *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সর্বপ্রথম 'বুরহান ওয়া বাছায়ির' নামে কুরআন মাজীদের তাফসীর লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিআইডি তাঁর কাগজপত্র তল্লাশি করার সময় ঐ তাফসীরের পাণ্ডুলিপিও নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি এর একটি পৃষ্ঠাও পাননি। এরপর তিনি 'তারজুমানুল কুরআন' লেখা শুরু করেন। যার অধিকাংশ রাঁচী ও মীরাঠের সেন্ট্রাল জেলে লিখেন। মাওলানার ভাষ্য অনুযায়ী ২৭ বছরের অধিক সময় ব্যাপী তিনি 'তারজুমানুল কুরআন' লিপিবদ্ধ করেন (দ্র. মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী, সীরাতে আযাদ (লাহোর : মুসলিম পাবলিকেশন্স, তা.বি), পৃঃ ৬৪)। 'ছাকাফাতুল হিন্দ' পত্রিকায় মাওলানার এই তাফসীরের আরবী অনুবাদ কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে ড. সাইয়িদ আব্দুল খতীফ হায়দারাবাদী এর ইংরেজী অনুবাদ করেন। ঐতিহাসিক গোলাম রসূল মেহের মাওলানার প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কতিপয় আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর 'বাকিয়াতে তারজুমানুল কুরআন' নামে প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'আল-কাওলুন মাতীন ফী তাফসীরে সূরা ওয়াত-তীন' নামে তিনি সূরা তীনের তাফসীর লিখেন। যেটি ১৩৪০ হিজরীতে লাহোরের কারীমী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় (দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৫৩-৫৪)।- অনুবাদক*

বিষয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কুরআন মাজীদের আলোকে তাঁর সকল দাওয়াতী কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। উপমহাদেশের আলেমগণ তাঁকে 'ভারতবর্ষের ইবনে তায়মিয়া' বলে অভিহিত করতেন।

কালের এই অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ১৩০৫ হিজরীর ১লা যুলহিজ্জাহ (৯ই আগস্ট ১৮৮৮) মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৩৭৭ হিজরীর ২রা শা'বান) দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।

উর্দূ পদ্যে কুরআনের অনুবাদ :

আব্দুল আযীয খালেদ আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দখল রাখতেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কবি ছিলেন। তিনি ৩৩টি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, যার মধ্যে ৩টি গ্রন্থ গদ্যে এবং ৩০টি তাঁর কাব্য সংকলন। তাঁকে পাকিস্তানের বড় সরকারী অফিসারদের মধ্যে গণ্য করা হ'ত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদের উর্দূ পদ্যানুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ পণ্ডিত মহলে সাদরে গৃহীত হয়। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভীর দারুণ ভক্ত ছিলেন এবং উলূমে কুরআনে তাঁকে (নাদভী) নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মনে করতেন।

আব্দুল আযীয খালেদ ১৯২৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী (১৩৪৫ হিজরীর ১০শে রজব) জালন্ধর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) পরজিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারী (১২ই ছফর ১৪৩১) লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী ও পশতু অনুবাদ :

কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদের আলোচনায় শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর পরে হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীর ফার্সী অনুবাদ এবং তাঁর পাঞ্জাবী পদ্যে লিখিত 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' ও পাঞ্জাবী অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কুরআনের আরেকটি পাঞ্জাবী অনুবাদ সম্পর্কে শুনুন! এই অনুবাদটি খ্যাতিমান আলেম মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ নওশাহরাবীর। তিনি শিয়ালকোট যেলার 'নওশাহরাহ কাকে যিয়া' গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং কাকেযী বংশের লোক ছিলেন। নিজ গ্রামের কতিপয় শিক্ষকের নিকট কিছু কিতাব পড়ার পর শিয়ালকোটে আসেন এবং সেখানকার আলেমদের কাছ থেকে উপকৃত হন। এরপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লাহোর যাত্রা করেন এবং এই শহরের আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছুদিন পর লাহোর থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লী পৌঁছেন এবং সেখানে মিয়াঁ নাযীর হুসাইনের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। দিল্লীতে হেকিমি বিদ্যাও পড়েন। দীর্ঘ সময় তিনি এখানে কাটান। দিল্লী থেকে প্রস্থান করে অমৃতসরে আসেন এবং সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালের পর (১২৯৯ হিঃ) নিজ গ্রাম 'নওশাহরাহ কাকে যিয়া'তে আসেন। সেখানে অল্প কিছুদিন অবস্থান করে রাওয়ালপিণ্ডিতে চলে যান এবং সেখানে হেকিমি চিকিৎসা শুরু করেন। রাওয়ালপিণ্ডির আহলেহাদীছ মসজিদে ইমামতি ও খতীবের দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন এবং পাঞ্জাবীতে সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখেন। ১৯১১ সালে (১৩২৯ হিঃ) কোন কাজের সূত্রে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শিয়ালকোটে আসেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৃতীয় দিন শিয়ালকোটে তাঁর মৃত্যু হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী তাঁকে গোসল দেন এবং জানাযার ছালাত পড়ান। সেখানে মঙ্গা শাহের কবরস্থানে ঈদগাহের দেয়ালের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আমার জানা মতে খাঁটি পাঞ্জাবী ভাষায় কুরআন মাজীদের দু'টি অনুবাদ হয়েছে, যা আহলেহাদীছ আলেমগণ করেছেন। একটি অনুবাদ করেছেন হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী (মৃঃ ছফর ১৩৩১ হিঃ/সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রিঃ) এবং অন্যটি করেছেন মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ নওশাহরাবী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ/১৯১১ খ্রিঃ)।

মাওলানা আব্দুত তাওয়াব মুলতানীকে উপমহাদেশের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি নিজ শহর মুলতানে 'মাকতাবা সালাফিয়া' নামে গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের সিলসিলা শুরু করেছিলেন এবং মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য আলেম ও ছাত্র জ্ঞানার্জন করেন। তিনিই প্রথম আলেম যিনি সারায়েকী (বা মুলতানী) ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন এবং টীকা লিখেন। এর সাথে শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীর উর্দূ অনুবাদ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই অনুবাদটি হারিয়ে গেছে। শুধু ১ম ও ত্রিশ পারার অনুবাদ সংরক্ষিত ছিল, যা প্রকাশ করা হয়েছে। মাওলানা আব্দুত তাওয়াব মুলতানী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্রত্ব গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৮৭১ সালের ৩১শে আগস্ট (১২৮৮ হিজরীর ১৪ই জুমাদাল আখেরাহ) মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৯শে মে (১৩৬৬ হিজরীর ৯ই রজব) সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান হাফীয ভাওয়ালপুরের রিয়াসাতী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন। ১৩৭২ হিজরীতে (১৯৫৩ খ্রিঃ) ভাওয়ালপুরের আযীযুল মাতাবে প্রেস থেকে যেটি প্রকাশিত হয়। এই ভাষাটি মুলতানী ভাষার সাথে মিলে যায়। মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান হাফীযের জীবনী আমি জানতে পারিনি। রিয়াসাতী ভাষায় অনূদিত কুরআন মাওলানা আবু হামযা আব্দুল হামীদ সালাফী (মুসলিম কলোনী, রোড নং ২, খায়েরপুর সাদাত, আলীপুর, যেলা মুযাফ্ফরগড়) আমাকে প্রদান করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞভাজন।

মাওলানা আব্দুল গাফফার যামেরানী ছিলেন প্রথম আলেম যিনি বালুচী ভাষায় কুরআন অনুবাদের সূচনা করেছিলেন। এই সিলসিলা ২৫ পারা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকার পর তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয় এবং করাচীর এক হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মাওলানা বেলুচিস্তান প্রদেশের মুকরান এলাকার এক

পাহাড়ী স্থান 'যামেরানে' ১৯৩৪ সালে (১৩৫২ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৪ সালের ৩১শে মে (১৪২৫ হিজরীর ১১ই রবীউছ ছানী) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম রুস্তমী ১৩৫৯ হিজরীর রামাযান মাসে (নভেম্বর ১৯৪০) সারহাদ প্রদেশের মারদান যেলার রুস্তম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে দেওবন্দী হানাফী ছিলেন এবং হানাফী মাদরাসাগুলিতে জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর আহলেহাদীছ হন এবং দরস-তাদরীস ও লেখনীতে সীমাহীন খিদমত আঞ্জাম দেন। পশতু ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন এবং তাফসীরও লিখেন। যেটি ১৬৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী। এর নাম 'তাফসীরুল কুরআনিল কারীম' (تفسير القرآن الكـــريم)। মাওলানা আব্দুল মালেক মুজাহিদ প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'দারুস সালাম' এই তাফসীরটি প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছে। উন্নত কাগজ, চমৎকার ছাপা এবং দৃষ্টিনন্দন বাঁধাইয়ের পশতু ভাষার এই অনুবাদ ও তাফসীর এক চমৎকার উপহার। যা প্রথমবারের মতো কুরআন প্রেমিকরা লাভ করেছে। দো'আ রইল আল্লাহ যেন তাকে (আব্দুল মালেক) দ্বীনের বেশী বেশী খিদমত করার তৌফিক দেন।

পাকিস্তানী আলেম মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ সিন্ধু প্রদেশের তহসিল বাদীনের কুণ্ডী নামক গ্রামে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৮৪ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র বংশের সন্তান ছিলেন। ধীরে ধীরে জ্ঞানার্জন করেন। রাজনীতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে তিনি খেলাফত আন্দোলন সহ অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং বন্দী হন। ১৯৩২ সালে তিনি আহলেহাদীছ হন। অতঃপর আল্লাহ তৌফিক দিলে সিন্ধী পদ্যে কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন। এর পূর্বে সিন্ধী পদ্যে কুরআনের অনুবাদের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সিন্ধী ভাষার এই পদ্যানুবাদ ১৩ বছরে সমাপ্ত হয়। তিনি এর নাম রাখেন 'নূরুল কুরআন মানযূম তারজামাতুল কুরআন' (نور القرآن منظوم ترجمة القرآن)। ১৪১৫ হিজরীতে (১৯৯৪ খ্রিঃ) এই অনুবাদটি সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ্‌র সময়ে সিন্ধুতে একটি বড় ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বাদীনের নিকটবর্তী স্থানে 'লাওয়ারী' নামে একটি খানকা আছে। যেখানে প্রথম দিকে ওরস ও মেলা বসত। কিন্তু ১৯৩৮ সালে যথারীতি ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ৯ই যিলহজ্জ লাওয়ারীতে গরীবদের জন্য হজ্জের খুৎবা পড়া হবে। তাছাড়া প্রচার করা হয় যে, যে ব্যক্তি হজ্জের দিনগুলোতে হজ্জের নিয়তে লাওয়ারী দরগায় উপস্থিত হবে, সে আল্লাহ্‌র নিকট হাজী ও মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। দরগার বাইরে একটি সাইনবোর্ডে এই কথাগুলো লেখা হয়েছিল- 'হাজী, নাজী, গাযীকে শত শত মুবারক ও সালাম। ৩-টার সময় হজ্জের খুৎবা প্রদান করা হবে'। এমনকি লাওয়ারীর মাটিকে মক্কা-মদীনার সাথে তুলনা করা হয় *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যমযমের পানি, আরাফাত এবং বাকী কবরস্থানের নামও নির্বাচন করা হয়।

এই মুশরিকী ও ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের কথা শুনে শুধু সিন্ধু প্রদেশই নয় বরং যেখানে যেখানে এই প্রাণঘাতী খবর পৌঁছেছিল, সেখান থেকে তাওহীদপন্থীদের কাফেলা একের পর এক বাদীনে পৌঁছতে শুরু করে। তাদের মধ্যে আফগানী, সিন্ধী, বালুচী, পাঞ্জাবী সবাই ছিল। ঐ তাওহীদী কাফেলার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ। তিনি সেখানে পৌঁছা মাত্রই ঘোষণা করেন, হজ্জের জন্য আল্লাহ শুধুমাত্র মক্কা মুকাররমাকে নির্বাচন করেছেন। আমরা মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু লাওয়ারী বা অন্য কোন জায়গায় তোমরা যা করতে চাচ্ছ তা করতে দিব না। ইংরেজ শাসনের সময় ছিল। মাওলানাকে গ্রেফতার করা হল। জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করল। অবশেষে মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ সফলকাম হলেন এবং লাওয়ারীতে হজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ব্যর্থকাম হল। বৃটিশ সরকারও অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিল। এটি ছিল অনেক বড় ফিতনা, যা ১৯৩৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ্‌র দুঃসাহসী আন্দোলনের ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ১০০ বছর বয়স পেয়ে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুলাই (১৩৮৮ হিজরীর ২২শে রবীউছ ছানী) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধু প্রদেশের অনেক বড় আলেম পরিবারের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তিনি আরবী, উর্দূ ও সিন্ধীতে ১০৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি স্বীয় যুগের অনেক বড় বক্তাও ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কুরআন-হাদীছের সকল দিক ও বিভাগে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি উপমহাদেশের একমাত্র আলেম, যিনি সিন্ধী ভাষায় 'বাদীউত তাফাসীর' (بديع التفاسير) নামে কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেছেন। যেটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। সিন্ধু এলাকায় এই তাফসীরটি অপরিসীম গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তিনি ১৯২৫ সালের ১০শে জুলাই (১৯শে যুলহিজ্জা ১৩৪৩ হিঃ) ঝাণ্ডাপীর গ্রামে (যেলা হায়দারাবাদ, সিন্ধু) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ৮ই জানুয়ারী (১৬ই শা'বান ১৪১৪ হিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর :

এখন বাংলা ভাষার অনুবাদ ও তাফসীর সম্পর্কে শুনুন! বাংলা ভাষায় অনেক আলেম কুরআন মাজীদ সম্পর্কে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এর কিছু সূরার অনুবাদ করেছেন ও তাফসীর লিখেছেন। সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা আব্বাস আলী। তিনি ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল মুনশী তমীযুদ্দীন। তিনি চণ্ডীপুর, বশীরহাট, চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালের অক্টোবরে প্রথমত কুরআন মাজীদের শেষ পারার অনুবাদ করে কলকাতা থেকে

প্রকাশ করেন। যা কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এর দুই মাস পর ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত অনুবাদের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এটাও লোকেরা খুব আগ্রহভরে ক্রয় করে এবং পড়ে। এরপর ১৯০৯ সালে তিনি পুরা কুরআন মাজীদের টীকাসহ অনুবাদ আলতাফী প্রেস, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি ৯৬৭ পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত ছিল। কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে প্রথমে ছিল শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীর উর্দূ অনুবাদ, তারপর আব্বাস আলীর বাংলা অনুবাদ। বাংলা ও উর্দূ ভাষায় সংক্ষিপ্ত তাফসীরও ছিল। এই অনুবাদটি বঙ্গদেশে খুবই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে এবং বহুলভাবে পঠিত হয়। অল্পদিনের ব্যবধানে এটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর কলকাতা থেকে একাধিকবার ছাপানো হয়। তিনি ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলার প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা চালান এবং অবস্থাভেদে স্বীয় যুগের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, অল ইন্ডিয়া খেলাফত মজলিস, জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এগুলোর প্লাটফর্মে সোৎসাহে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য কয়েক বছর জেলে ছিলেন। সাংবাদিকতার ময়দানেও দারুণ সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলা ভাষায় তিনটি পত্রিকা চালু করেন। সেগুলো ছিল ১. সেবক ২. যামানা[২৭] ও ৩. দৈনিক আজাদ। বাংলা ভাষায় তাঁর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' নামেও একটি পত্রিকা ছিল। এ সকল পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আব্দুল বারী। পিতা-পুত্র দু'জনই মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জেলে থাকাবস্থায় কুরআন মাজীদের বঙ্গানুবাদ করেন।[২৮] তিনি ১৮৬৭ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং একশ বছরের কাছাকাছি বয়স পেয়ে ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

উপমহাদেশে কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ :

ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কেও পড়ুন! ১৯০৫ সালে ড. আব্দুল হাকীম খান প্রথম কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদ করেন। যিনি বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাবের পাটিয়ালা শহরের বাসিন্দা। তিনি কিছুকাল কাদিয়ানীদের সাথে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র রহমতে কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করেন। ইংরেজী ছাড়া তিনি কুরআনের উর্দূ অনুবাদও করেছিলেন। ড. আব্দুল হাকীম খানের ইংরেজী অনুবাদের পূর্বে ইউরোপীয় ভাষায় অমুসলিমরাই কুরআন মাজীদের অনুবাদ করত। অনুবাদের বিশুদ্ধতার কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না।[২৯] তিনি ১৩৫৯ হিজরীতে (১৯৪০ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

কুরআন মাজীদের একটি ইংরেজী অনুবাদ মির্যা হায়রাত দেহলভী করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মাদ উমরাও বেগ। মির্যা হায়রাত দেহলভী নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক ছিলেন। ১৮৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ সালে (১৩৪৬ হিঃ) সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। উপমহাদেশে কুরআনের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করার মর্যাদাও আহলেহাদীছগণ লাভ করেন।

---

২৭. *এটি ছিল উর্দূ দৈনিক, বাংলা নয়।-অনুবাদক*

২৮. *মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর প্রতিষ্ঠিত দৈনিক 'সেবক' পত্রিকায় ১৯২১ সালে 'অগ্রসর! অগ্রসর!!' শিরোনামে একটি জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১ বছর বন্দী করে রাখে। এ সময় তিনি কুরআন মাজীদের ৩০তম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর করেন। ১৯২২ সাথে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় (দ্র. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৯), পৃঃ ১১১, ১১৩; আবু জাফর সম্পাদিত, মাওলানা আকরম খাঁ (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ১০০৭, পৃঃ ১৬৯)। তাছাড়া তিনি ৬ খণ্ডে 'তাফসীরুল কোরআন' নামে বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর লিখেছেন।-অনুবাদক*

২৯. *আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ১৩।*

সময় পরিবর্তন
মাসিক আত-তাহরীক
ফাতাওয়া হটলাইন
০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
পরিবর্তিত সময়
প্রতিদিন বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

পঞ্চম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় কুরআন লিপিবদ্ধ ছিল না। ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর মৃত্যুর পরে কুরআন জমা করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন। আর নিশ্চয়ই এটা উত্তম কাজ যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে করা হয়েছে। যদি ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানা বৈধ না হ'ত, তাহ'লে কুরআনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশেই কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে পাথর, খেজুর পাতা, হাড্ডি ইত্যাদিতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কোন সূরার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার আশংকায় একত্রে জমা করার নির্দেশ দেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে অহী অবতীর্ণের সমাপ্তি ঘটেছে। সাথে সাথে কুরআন জমা করার প্রতিবন্ধকতাও দূরীভূত হয়েছে। এছাড়াও ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফেয শাহাদতবরণ করেছিলেন। এভাবে কুরআনের হাফেয শাহাদতবরণ করলে কুরআনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এই আশংকায় ছাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমতের ভিত্তিতে কুরআন সংকলন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যা ইজমায়ে ছাহাবা হিসাবে পরিগণিত। আর ইজমায়ে ছাহাবা একটি অকাট্য দলীল। হাদীছে এসেছে,

যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হওয়ার পর আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় ওমর (রাঃ) তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) বললেন, ওমর (রাঃ) আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধের শহীদদের মধ্যে ক্বারীদের (হাফেয) সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এভাবে যদি ক্বারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহ'লে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি ওমর (রাঃ)-কে বললাম, যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটি উত্তম কাজ। ওমর (রাঃ) এ কথা বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ) যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায়েদ (রাঃ) বলেন, তখন আবুবকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। তদুপরি তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর অহি লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন মাজীদের অংশগুলিকে অনুসন্ধান করে একত্রিত কর। আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পর্বত এক স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাহ'লেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হ'ত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটি কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবুবকর (রাঃ) বার বার আমার কাছে বলতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন, যেমন উন্মোচন করেছিলেন আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর বক্ষকে। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড এবং মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম...।[৩০]

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 'এটা (কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৭)*। সুতরাং তিনিই ছাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগ্রত করার মাধ্যমে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

তৃতীয়ত: কুরআন জমা করার মাধ্যমে নতুন কোন ইবাদতের জন্ম দেওয়া হয়নি; বরং তা সংকলনের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির নিকটে আল্লাহ্র বিধান সহজভাবে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে তা সংরক্ষণের পথকে দৃঢ় এবং মুখস্থ করার পথকে সুগম করা হয়েছে। অতএব কুরআন সংকলনের মত প্রশংসনীয় কাজকে বিদ'আতে হাসানার বৈধতার দলীল পেশ করা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

ষষ্ঠ দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় জুম'আর একটি আযানই প্রচলিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে ওছমান (রাঃ) সর্বপ্রথম দ্বিতীয় আযান চালু করেন। ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানাহ বৈধ না হ'লে ওছমান (রাঃ)-এর মত বিশিষ্ট ছাহাবী দ্বিতীয় আযান চালু করতেন না।

জবাব : হাদীছে এসেছে,

عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما، فَلَمَّا كَانَ فِيْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رضى الله عنه وَكَثُرُوْا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ-

'যুহরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বকর এবং ওমর (রাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন তখন প্রথম আযান দেওয়া হ'ত। অতঃপর যখন ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে লোকসংখ্যা

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৩০. বুখারী হা/৭১৯১।

বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি জুম'আর তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এই আযান দেওয়া হয়। পরে এ আযানের সিলসিলা চলতে থাকে।[৩১]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ)-এর যামানায় এবং ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও জুম'আর আযান একটিই ছিল। তারপর ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মসজিদে নববীর অনতিদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে মানুষ ব্যস্ত থাকত। তদানীন্তনকালে মাইক এবং ঘড়ি না থাকার কারণে মানুষ আযান শুনতে পেত না এবং জুম'আর ছালাতের সময় বুঝতে পারত না। এহেন প্রেক্ষাপটে ওছমান (রাঃ) একই সময়ে উক্ত বাজারে অতিরিক্ত একটি আযান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে মানুষ জুম'আর সময় বুঝতে পারে। তবে বর্তমানে মাইক, ঘড়িসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে; ফলে আযান শুনা ও ছালাতের সময় বুঝতে পারার প্রতিবন্ধকতাও দূরীভূত হয়েছে। সাথে সাথে জুম'আর অতিরিক্ত আযানের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। কেননা ওছমান (রাঃ) কর্তৃক চালুকৃত উক্ত আযান যদি সকল মসজিদের জন্য অপরিহার্য হ'ত তাহ'লে তিনি নিজেই সকল মসজিদে জুম'আর অতিরিক্ত আযান চালু করতেন। অথচ তিনি শুধুমাত্র 'যাওরা' নামক বাজারেই উক্ত আযান চালু করেছিলেন; অন্য কোন মসজিদে চালু করেননি। ওছমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আলী (রাঃ)–এর খেলাফতকালেও অন্য কোথাও উক্ত আযান চালু ছিল না। এমনকি মক্কাতেও নয়। অতএব ওছমান (রাঃ)-এর উক্ত নির্দেশ কখনোই সর্ব যুগের সকল মসজিদে জুম'আর অতিরিক্ত আযান বৈধ হওয়ার দলীল হ'তে পারে না। কেননা ওছমান (রাঃ)-এর নির্দেশিত আযানটি একটিমাত্র স্থানে দেওয়া হ'ত। আর তাও ছিল 'যাওরা' নামক বাজার। সুতরাং বাজারে চালু হওয়া আযান কিভাবে সর্বযুগের সকল মসজিদে সুন্নাত বলে বিবেচিত হ'তে পারে?

সপ্তম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের এমন কতগুলি আমলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যা তিনি নিজে করেননি এবং করতেও বলেননি। যেমন- (ক) একদা প্রচণ্ড শীতের কারণে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) অপবিত্র অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে রাসূল (ছাঃ) তা স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩২]

(খ) প্রত্যেক ওযূর পরে বেলাল (রাঃ)-এর দুই রাক'আত ছালাতকে রাসূল (ছাঃ) স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩৩]

(গ) ছুটে যাওয়া ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত সুন্নাতকে ফরয ছালাতের পরপরই আদায় করাকে রাসূল (ছাঃ) স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন- ক্বায়েস ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত পড়িনি। তখন রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন'।[৩৪]

অতএব ইসলামী শরী'আতে বিদ'আতে হাসানা বৈধ বলেই রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের উল্লিখিত ভাল আমলগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

জবাব : রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের কিছু ভাল আমলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তেমনি তিনি ছাহাবায়ে কেরামের কতগুলি আমলকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যা তাঁরা উত্তম আমল হিসাবেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন জনের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ীতে আসল। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানানো হ'ল তখন তারা এটিকে কম মনে করল। অতঃপর তারা বলল, রাসূল (ছাঃ) কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তাদের একজন বলল, আমি প্রতি রাতে জেগে ছালাত আদায় করব। অপর ব্যক্তি বলল, আমি প্রতিদিন ছিয়াম পালন করব, কখনো ছিয়াম ত্যাগ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি নারীর সংশ্রব থেকে দূরে থাকব এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরাই কি তারা, যারা এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছ? সাবধান! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি রাত্রের কিছু অংশে (নফল) ছালাত আদায় করি এবং

---

৩১. বুখারী হা/৯১৬, 'জুম'আ' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪০৪।
৩২. আবুদাউদ হা/৩৩৪, 'নাপাক অবস্থায় ঠাণ্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।
৩৩. তিরমিযী হা/৩৬৮৯; মিশকাত হা/১৩২৬; ছহীহ তারগীব হা/২০১।
৩৪. আবুদাউদ হা/১২৬৭; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১০৪৪, সনদ ছহীহ।

কিছু অংশ ঘুমাই। কোন কোন দিন (নফল) ছিয়াম পালন করি এবং কোন কোন দিন ছিয়াম ত্যাগ করি। আর আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে), সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৫]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত তিন জন ছাহাবীর কারো উদ্দেশ্যই খারাপ ছিল না। ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা অবশ্যই ভাল কাজ। আরেকজন বিবাহ না করে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত করতে চেয়েছিল, তার উদ্দেশ্যও ভাল ছিল। অথচ রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের উল্লিখিত ভাল আমলগুলিকে স্বীকৃতি দেননি; বরং তাদেরকে সুন্নাত পরিপন্থী আমলকারী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন এবং উম্মত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার মত হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

সম্মানিত পাঠক! রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলে গেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল, আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[৩৬] আর সুন্নাত হ'ল,

مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ وَعَلَى مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَو الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ–

'সুন্নাত হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এবং যা ছাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষ থেকে এসেছে'।[৩৭]

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করতে বলেছেন ও যা তিনি নিজে করেছেন, তা করা সুন্নাত। আর যা তিনি করতে বলেননি এবং নিজেও করেননি। কিন্তু অন্য কাউকে করতে দেখলে তাকে নিষেধ করেননি, তাঁর এরূপ মৌনসম্মতিও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগে সৃষ্ট কোন আমলই সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং তা সুন্নাত পরিপন্থী আমল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বর্তমানে বেঁচে নেই যে, তিনি মৌনসম্মতি প্রদান করবেন! সুতরাং সুন্নাত পরিপন্থী কোন আমল ইসলামী শরী'আতে জায়েয হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

বিদ'আতের হুকুম

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত নাযিল করেছেন। সেই অহি-র বিধানই অভ্রান্ত জীবন বিধান যা পালনে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। পক্ষান্তরে মানুষ যখন তা অগ্রাহ্য করে এবং নিজেদের মন মত বিধান জারি করার মাধ্যমে বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখন তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক সব কর্মই হারাম। যেমন- রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক জুম'আর খুৎবায় বলতেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ–

'সর্বোত্তম হাদীছ হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও সর্বোত্তম হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর সবচাইতে নিকৃষ্ট কর্ম হ'ল শরী'আতের মধ্যে নতুন নতুন কাজের উদ্ভব ঘটানো। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[৩৮] নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ 'আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যাবে'।[৩৯] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِيْ اخْتِلَافًا شَدِيْدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ–

ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং এক সারগর্ভ বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য শুনে চক্ষুসমূহ হ'তে অশ্রু প্রবাহিত হল এবং অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হল। তখন বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদেরকে বিদায়ী উপদেশ দিলেন (মনে হচ্ছে)। অতএব আপনি আমাদেরকে কি অছিয়ত করছেন? তিনি (রাসূল) বললেন, আমি তোমাদেরকে অছিয়ত করছি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং আমীরের কথা শুনা ও তার আনুগত্য করার, যদিও সে হাবশী (কৃষ্ণকায়) গোলাম হয়। কারণ আমার পড়ে বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দ্বারা মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরা।

---

৩৫. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৩৬. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, অনুচ্ছেদ ঐ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১৩২ পৃঃ সনদ হাসান।

৩৭. আল-মাকাছেদ ইনদাল ইমাম শাতেবী ১/৪৮৩ পৃঃ।

৩৮. মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৩৯. নাসাঈ হা/১৫৭৯।

অতএব সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন কাজ হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'।[৪০]

আর এরূপ নব আবিষ্কৃত বিদ'আত কর্ম সম্পাদনের ফলে ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় কঠিন দিনে, মাথার সন্নিকটে অবস্থানরত সূর্যের প্রচণ্ড তাপদাহে মানুষ যখন পিপাসিত থাকবে এবং হাউযে কাউছারের পানি ব্যতীত কোন পানি থাকবে না। সেদিন তাদেরকে উক্ত পানি পান থেকে বঞ্চিত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ-

'আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের (হাউযে কাউছার) নিকটে পৌঁছে যাবে। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, এরাতো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক দূর হোক (আল্লাহ্র রহমত থেকে), যারা আমার পরে দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে'।[৪১]

সম্মানিত পাঠক! হাউযে কাউছারের পানি পান থেকে বিতাড়িত হওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল বিদ'আতী আমল করা। আর পানি পান থেকে বিতাড়িত হওয়ার অর্থই হ'ল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। সুতরাং বিদ'আতীদের পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন!

[চলবে]

৪০. আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

৪১. বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মুসলিম হা/২২৯০; মিশকাত হা/৫৫৭১।

সংশোধনী

'মি'রাজ রজনীতে করণীয় ও বর্জনীয়' শীর্ষক নিবন্ধের প্রথম বাক্য 'মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রজব মাসে' ভুলক্রমে লেখা হয়েছে। অনুরূপভাবে একই নিবন্ধের ১৯ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারার শেষের লাইনে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের একেবারে শেষের দিকে হয়েছিল'-এর পরিবর্তে 'মাক্কী জীবনের শেষের দিকে হয়েছিল' পড়তে হবে।- *সম্পাদক*

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[৪২]

(খ) রাসূলুলাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আলাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আলাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[৪৩]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিলাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিলাহ' বলে শেষ করবে।[৪৪] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতালাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআলাহ'*। অর্থঃ 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আলাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪৫]

৩. রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৪৬]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা

৪২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
৪৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৪৪. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪৫. আবূদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৪৬. আবূদাউদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।

ইফতার দেরীতে করে'।[৪৭] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৪৮]

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৪৯] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৫০]

৬. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উলেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[৫১]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫২] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[৫৩]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[৫৪] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[৫৫]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[৫৬] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আলা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আলাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[৫৭]

৮. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[৫৮] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত **১২** তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৫৯] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[৬০]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[৬১] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৬২] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[৬৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[৬৪] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[৬৫]

---

৪৭. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৪৮. নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৪৯. বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৫০. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
৫১. বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম হা/৭৩৮; আবূদাঊদ হা/১৩৪১; নাসাঈ হা/১৬৯৭; তিরমিযী হা/৪৩৯; আহমাদ হা/২৪১১৯; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৯৪।
৫২. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
৫৩. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
৫৪. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ 'সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃঃ; মির'আত ৪/৩২০।
৫৫. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
৫৬. মিশকাত হা/১৩০২।
৫৭. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
৫৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
৫৯. আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
৬০. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
৬১. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
৬২. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
৬৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
৬৪. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
৬৫. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল

*আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রাযযাক**

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নন মর্মে পেশকৃত দলীল সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা

১. মহান আল্লাহ বলেন, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 'আমরা রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করি না' *(বাক্বারাহ ২/১৩৬)*। যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বলতে চান না তাদের সবচেয়ে বড় দলীল এই আয়াতটি।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে এই আয়াতটি নিয়ে এসেছেন দুই জায়গায়। সূরা বাক্বারাহ ১৩৬, সূরা আলে ইমরান ৮৪। সব জায়গাতে আগে রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর এই আয়াত নিয়ে এসেছেন। আমরা সূরা বাক্বারার সম্পূর্ণ আয়াত পেশ করছি। কারণ অনেকেই শুধু আয়াতের এই অংশকে পেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ-

'তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাদের বংশধরদের প্রতি। আরও যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অন্য নবীদেরকে যা দেয়া হয়েছে তাঁর প্রতি। বস্তুত আমরা তাদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৩৬)*।

এই আয়াত পড়ার পর একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে যে, এখানে পার্থক্য করি না অর্থ কুফরী করি না বরং ঈমান আনি। কেননা আয়াতের আগের আলোচনাতে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান আনতে বলেছেন এবং শেষে ঈমানের বিপরীত কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। এজন্যই মহান আল্লাহ হরফে আতফ বা সংযোজক অব্যয় নিয়ে আসেননি। সালাফে ছালেহীনও এই আয়াতের এমন তাফসীরই করেছেন। যেমন হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمنوا بهم كلّهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم- 'এবং তারা যেন রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য না করে বরং তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনে। আর আল্লাহ যাদের সম্পর্কে এমনটি বলেছেন তারা যেন তাদের মতো না হয়'।[৬৬]

এরপর হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) কুরআনের তাফসীর কুরআনের আয়াত দিয়ে করেছেন।

সূরা বাক্বারার আয়াতে আল্লাহ রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করতে নিষেধ করলেন। এখন এই পার্থক্য করা দ্বারা আল্লাহ্র কি উদ্দেশ্য তা আমরা তখনই জানতে পারব, যখন জানতে পারব যে, মহান আল্লাহ এই পার্থক্য করাকে অন্য জায়গায় কি অর্থে ব্যবহার করেছেন। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এখানে সূরা নিসার ১৫০-১৫১ নং আয়াত নিয়ে এসেছেন, যেখানে এই পার্থক্য করার কথা রয়েছে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا- 'আর তারা চায় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করবে এবং বলবে, আমরা কারো উপর ঈমান আনি এবং কারো কুফরী করি এবং তারা এর মাঝে একটা রাস্তা গ্রহণ করতে চায়। বস্তুত তারাই সত্যিকারের কাফের' *(নিসা ৪/১৫০-১৫১)*।

এখানে মহান আল্লাহ পার্থক্য করার কথা স্পষ্টভাবে বলছেন যে, কারো উপর ঈমান আনা এবং কারো সাথে কুফরী করা হ'ল রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করা।

ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'আমরা কতিপয় নবীর প্রতি ঈমান আনি এবং কতিপয় নবীর সাথে কুফুরী করি এরূপ করি না। আমরা কতিপয় নবীর সাথে সম্পর্ক করি আবার কতিপয় নবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি এরূপ করি না। যেমনটা ইহুদীরা ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এ দু'জন ব্যতীত সকলের প্রতি ঈমান এনেছে। অনুরূপভাবে নাছারারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি। তিনি ব্যতীত সকলের প্রতি তারা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমরা সকল নবী ও রাসূলগণের জন্য সাক্ষ্য দেই যে, তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহ্র নবী ও রাসূল ছিলেন। তাঁরা সত্য ও হেদায়াতসহ প্রেরিত হয়েছিলেন'।[৬৭]

অতএব এই কথা এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আমরা রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করি না আয়াতের অর্থ যদি করা হয় যে, আমরা রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি না তাহ'লে কুরআনের আয়াতের অর্থের বিকৃতি ঘটানো হবে। কেননা স্বয়ং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নিজেও কুরআনে রাসূলগণের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'হে নবী! তুমি রাসূলগণের মধ্যে থেকে যারা উলুল আযম বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাহসী রাসূল তাদের মত ধৈর্যধারণ কর' *(আহক্বাফ ৩৫/৩৫)*।

* *দাওরায়ে হাদীছ (শেষ বর্ষ), দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।*

৬৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*
৬৭. তাফসীরে তাবারী, ৩/১১০, সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে শুরু করে সকল মুফাসসিরে কুরআন এই বিষয়ে একমত যে, এই উলুল আযম রাসূল হচ্ছেন ৫ জন- মুহাম্মাদ (ছাঃ), ইবরাহীম, নূহ, মূসা ও ঈসা (আঃ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, خِيَارُ وَلَدِ آدَمَ خَمْسَةٌ نُوْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسَى وَعِيْسَى وَمُحَمَّدٌ وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ 'আদম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন পাঁচ জন, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আর তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[৬৮]

এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মাঝে পাঁচজনকে এই মহান গুণে গুণান্বিত করে অন্যদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ– 'এই যে রাসূলগণ, এদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এদের মধ্যে এমনও আছে যাদের সাথে মহান আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। ঈসা ইবনু মারিয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং তাকে রুহুল কুদুস (জিব্রীল) দ্বারা সহযোগিতা করেছি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৩)*।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ রাসূলগণের মাঝে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাইতো ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ঐ সমস্ত হাদীছের পাঁচভাবে জবাব দিয়েছেন যেখানে রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এই আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রাসূলগণ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে সমান নন।[৬৯]

যদি এই আয়াতের অন্য উদ্দেশ্য হ'ত তাহ'লে তোমরা রাসূলগণের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না মর্মে বর্ণিত হাদীছকে তিনি এই আয়াতের বিরোধী মনে করতেন না এবং এই হাদীছের পাঁচভাবে জবাব দিতেন না।

অতএব উপরে উল্লিখিত দু'টি আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

২. তোমরা নবীদের মাঝে প্রাধান্য দিও না :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ 'তোমরা রাসূলগণের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না'।[৭০] আলোচ্য হাদীছের নিম্নোক্ত তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১. শাব্দিক বিশ্লেষণ :

মূলত এই হাদীছটি তিনটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

১. لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ 'তোমরা রাসূলগণের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না'। উক্ত হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ এবং তাঁর থেকে আব্দুল্লাহ বিন ফযল বর্ণনা করেছেন।

২. لَا تُخَيِّرُونِيْ عَلَى مُوسَى 'তোমরা মূসাকে বাদ দিয়ে আমাকে বেছে নিও না'।[৭১]

৩. لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ 'তোমরা রাসূলগণের মাঝে কাউকে বেছে নিও না'।[৭২]

এখানে لَا تُفَضِّلُوا শব্দটি প্রাধান্য পাবে। কেননা لَا تُخَيِّرُوْا এই শব্দে শুধুমাত্র আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ থেকে আবদুল্লাহ বিন ফযল বর্ণনা করছেন। অথচ এই হাদীছই ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ থেকে বর্ণনা করছেন لَا تُخَيِّرُوْنِي শব্দ দিয়ে। শুধু আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ থেকেই তিনি এভাবে বর্ণনা করেননি; বরং আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ ব্যতীত আরো দু'জন রাবী থেকেও তিনি এই শব্দে বর্ণনা করছেন। তাঁর মধ্যে একজন হচ্ছেন বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহঃ)।

অতএব তিনটি কারণে। لَا تُخَيِّرُوا 'তোমরা নবীদের মাঝে কাউকে বেছে নিও না' এই শব্দটি প্রাধান্য পাবে।

(১) সংখ্যাধিক্য। কেননা তিন জন রাবী এভাবে বর্ণনা করছেন এবং এই তিন জনের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়িব-এর মত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর খাছ ছাত্র আছেন।

(২) যে আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ থেকে আবদুল্লাহ বিন ফযল বর্ণনা করছেন, সে আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ থেকে ইবনু শিহাব যুহরীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি আব্দুল্লাহ বিন ফযল থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করছেন। আর মুহাদ্দিছ মাত্রই ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ)-এর দৃঢ়তা ও শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি অবগত।

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত সকল সনদে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব যখন প্রমাণিত হ'ল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মূলত لَا تُخَيِّرُوْا বা 'তোমরা নবীদের মাঝে কাউকে বেছে নিও না' শব্দ বলেছেন। এখন এবার আমরা এই শব্দের কি অর্থ হতে পারে তা বিশ্লেষণ করব।

মি'রাজের রাত্রে যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সামনে দুধ ও মদ দিয়ে যে কোন একটি গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল, তখন তিনি দুধ বেছে নিয়েছিলেন (فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ)।[৭৩]

এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, 'তাখয়ীর' হচ্ছে একটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটাকে গ্রহণ করা। যারা আরবী ভাষায় পারদর্শী তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, 'তাখয়ীর' মাছদার এর

৬৮. *মুসনাদে বাযযার, সিলসিলাতুল আছার আছ-ছাহীহাহ হা/৪৬৪, সনদ হাসান, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৩৯২৯, যঈফুল জামে' হা/২৮৭৬*।
৬৯. তাফসীর ইবনে কাছীর-এর এই আয়াত সংশ্লিষ্ট তাফসীর দ্রঃ।
৭০. *বুখারী হা/৩৪১৪, মুসলিম হা/২৩৭৩, মিশকাত হা/৫৭০৯*।
৭১. *বুখারী হা/২৪১১*।
৭২. *বুখারী হা/২৪১২*।
৭৩. *মুসলিম হা/১৬২, মিশকাত হা/৫৮৬৩*।

অর্থ হচ্ছে, একটিকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটিকে গ্রহণ করা বা একটির মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকার কারণে তার উপর আরেকটিকে প্রাধান্য দেয়া।

সুতরাং এই হাদীছের কেউ যদি এই অর্থ করে যে, তোমরা রাসূলগণের মাঝে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না তাহ'লে সে অর্থের বিকৃতি ঘটাবে। বরং সঠিক অর্থ হবে তোমরা অন্য রাসূলকে ছেড়ে আমাকে প্রাধান্য দিয়ো না। আর এই ধরনের কাজ মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। যে করবে সে কাফের।

আর যদি 'লা তুফায্যিলূ' শব্দ তথা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া অর্থ মেনে নেওয়া হয় তাহ'লে শানে উরূদ বা হাদীছের প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

২. শানে উরূদ : কুরআনের তাফসীরে যেমন শানে নুযূলের গুরুত্ব থাকে, তেমনি হাদীছের ব্যাখ্যায় শানে উরূদের গুরুত্ব থাকে। অর্থাৎ এই হাদীছ বলার পিছনের কাহিনী বা প্রেক্ষাপট কি?

ঘটনাটি হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে গিয়ে আরেকজনের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে অন্য নবীর শানে গুস্তাখী বা অসমীচীন আচরণ করলে তিনি এই হাদীছ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তোমরা রাসূলগণের মাঝে এভাবে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাদের শানে গুস্তাখী কর না। কেননা অন্য নবীগণও অনেক সম্মানী, তারাও আল্লাহ্র রাসূল।

৩. সালাফে ছালেহীন-এর ব্যাখ্যা :

১. ইমাম বাগাভী (রহঃ) তাঁর 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'রাসূলগণের মাঝে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, আমরা বিশ্বাস করব তাঁরা সকলেই মর্যাদাগতভাবে সমান। কেননা স্বয়ং আল্লাহই আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, তিনি কোন রাসূলকে অন্য রাসূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'এই যে নবীগণ, তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৩)*। বরং এর অর্থ হচ্ছে কোন নবীর শানে অসমীচিন কথা বলে এবং তাদের অমর্যাদা করে অন্য নবীকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে তাদের কারো ব্যাপারে আক্বীদায় ফাসাদ সৃষ্টি হয়। আর এটা কুফুরী'।[৭৪]

২. অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ এখানে এটা উদ্দেশ্য যে, ফযীলত দিতে গিয়ে যেন অন্য নবীদের অপমান না করা হয়।[৭৫]

৩. ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁর দালায়েলুন নবুঅতে বলেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, আমি রাসূলগণের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছি। এই আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, তিনি তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে পার্থক্য করেছেন। আর রাসূলগণের মাঝে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া নিষেধ মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো মূলতঃ আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কের সময়ে তাদের নবীর উপর আমাদের নবীকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে। কেননা যখন দুই ধর্মের অনুসারীর মাঝে নবীগণকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে ঝগড়া হবে, তখন তাঁরা নবীগণের শানে বেয়াদবী করবে এবং তাদের মানহানি করে ফেলবে। ফলে এর দ্বারা তাঁরা কাফের হয়ে যাবে'।[৭৬] মোটকথা হচ্ছে- প্রাধান্য দিতে গিয়ে যেন কোন নবী ও রাসূলের মানহানি না হয়।

৩. 'যে বলবে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে মিথ্যুক'।

আমরা এই হাদীছেরও তিনভাবে ব্যাখ্যা করব।

হাদীছের অর্থ :

এখানে আমি দ্বারা কে উদ্দেশ্য? যদি বলি মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাহ'লে এই হাদীছের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই হাদীছের আরেকভাবেও অর্থ করা যায়। আমি দ্বারা প্রত্যেক কথক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) বলতে চেয়েছেন, কেউ যদি বলে যে, আমি তথা ঐ কথক ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহ'লে সে মিথ্যুক। আর এটা স্পষ্ট যে, আম জনসাধারণ যদি নিজেকে ইউনুস (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে তাহ'লে সে মিথ্যুক হবে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে দু'টি দলীল পেশ করা হ'ল-

১. হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে এভাবে এসেছে- وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'আমি বলি না যে, কেউ ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ'।[৭৭]

এখানে রাসূল (ছাঃ) আমি ব্যবহার করেননি; বরং বলেছেন, কেউ। সুতরাং এখান থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য নেয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তা শেষ হয়ে যায়। বরং আম জনসাধারণের কেউ যদি দাবী করে যে, সে ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহ'লে সে মিথ্যুক হবে।

২. একটি হাদীছে কুদসী এই অর্থকে নিশ্চিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, لاَ يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'আমার কোন বান্দার উচিত নয় যে, সে বলবে আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ'।[৭৮] সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এখানে আল্লাহ্র প্রত্যেক বান্দা উদ্দেশ্য; মুহাম্মাদ (ছাঃ) নয়।

প্রশ্ন হ'তে পারে, আম জনসাধারণ কিভাবে নিজেকে একজন নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে পারে? আরেকটি প্রশ্ন হ'তে পারে, শুধু ইউনুস (আঃ)-এর সাথে কেন খাছ করলেন? অন্য নবীদের কথা কেন বললেন না? এ বিষয়ে জানার জন্য আমাদেরকে শানে উরূদ বা হাদীছের প্রেক্ষাপট জানতে হবে।

শানে উরূদ :

মূলতঃ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আমাদের রাসূলকে বলেছিলেন যে, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ

৭৪. শারহুস সুন্নাহ, ১৩/২০৪।
৭৫. ফাতহুল বারী, হা/৩১৫৬, ১০/২০৫।
৭৬. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ৫/৪৯১।
৭৭. বুখারী হা/৩৪১৫; মুসলিম হা/২৩৭৩ 'মূসা (আঃ)-এর ফযীলত' অধ্যায়।
৭৮. বুখারী হা/৩৩৯৫, মুসলিম হা/২৩৭৬।

اَلْحُــوتِ ‘তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ কর, ইউনুস এর মত হয়ো না’ *(ক্বালাম ৪৮)*।

আর নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, ইউনুস (আঃ) তাঁর জাতির আচরণে ধৈর্য ধারণ না করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলছেন, তুমি ইউনুস (আঃ)-এর মত ধৈর্যহীন হয়ো না; বরং উলুল আযমদের মত ধৈর্যশীল হও!

এর দ্বারা অনেকের মনে হ’তে পারে যে, এই আয়াতে ইউনুস (আঃ)-এর মত হ’তে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব তিনি খারাপ *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

এখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ যদি আমাদের রাসূলকে ভাল এবং ইউনুস (আঃ)-কে খারাপ বলে বা নিজেকেই ভাল বলে তাহ’লে সে মিথ্যুক হবে। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের অন্তর থেকে এই আয়াতের কারণে সৃষ্টি হওয়া খারাপ ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে এই হাদীছ বলেছেন।

তাই আজও যদি কুরআন পড়ার সময় এই আয়াত পাঠে কারো অন্তরে ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয় তাহ’লে তাঁর আক্বীদাকে সংশোধন করার জন্য তাঁর সামনে এই হাদীছ পেশ করা হবে।

সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা :

আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন,

‘রাসূল (ছাঃ) এই কথা তখনই বলেছিলেন, যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল যে, ইউনুস (আঃ) তাঁর জাতির আচরণ সহ্য না করে রাগান্বিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এর ফলে তাঁর যা হবার তাই হ’ল। কেননা আল্লাহ্র রাসূলগণের সম্মান করা, তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব’।[৭৯]

একই ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম নববী (রহঃ) ও ইমাম সৈয়ূতী (রহঃ)। তাঁরা বলেন, ‘আলেমগণ বলেছেন, এটা ঐ সমস্ত জাহেলদের প্রতি সতর্কীকরণ, যারা ইউনুস (আঃ)-এর সম্মানে বিন্দুমাত্রও কমতি করে। এজন্য যে, কুরআনে তাঁর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে এবং এজন্যই এখানে শুধুমাত্র ইউনুস (আঃ)-এর নাম নেয়া হয়েছে, অন্য নবীদের নাম নেয়া হয়নি’।[৮০]

অতএব কেউ যদি এই হাদীছ দ্বারা সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত বলতে চায় যে, এই হাদীছে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইউনুস (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। তাহ’লে হাদীছের অর্থের ও উদ্দেশ্যের বিকৃতি ঘটবে।

কেউ যদি এই হাদীছ দ্বারা বলতে চায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইউনুস (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। তাহ’লে তাঁর জন্য যরূরী হবে সে যেন কুরআনের ঐ আয়াতের জবাব দেয় যেখানে আল্লাহ ইউনুস (আঃ)-এর মত হ’তে নিষেধ করেছেন এবং উলুল আযম-এর মত হ’তে বলেছেন এবং আমাদের রাসূল উলুল আযম-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

৭৯. শরহে আবু দাউদ, ২৬/৪৫২, ‘নবীদের মধ্যে প্রাধান্য দেয়া’ অনুচ্ছেদ দ্রঃ।
৮০. ইমাম নববী, শরহে মুসলিম, ১৫/১৩২, ইমাম সৈয়ূতী, শরহে মুসলিম ৫/৩৬০, হা/২৩৭৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

কেননা তখন এই আয়াত এবং হাদীছ পরস্পর বিরোধী হবে। কেননা আয়াত আমাদের রাসূলকে শ্রেষ্ঠ বলছে এবং হাদীছ তা অস্বীকার করছে।

আর ফযীলতের বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীছের আরেকটা ব্যাখ্যা নিম্নরূপ- কেউ যদি এক রাসূলকে আরেক রাসূলের উপর এই মনে করে প্রাধান্য দেয় যে, অন্য রাসূলগণ তাদের নবুঅতের হক আদায় করতে পারেননি অর্থাৎ মূসা, ইউনুস (আঃ) তাদের নবুঅতের হক আদায় করতে পারেননি, আমাদের রাসূল পেরেছেন; তাহ’লে সে মিথ্যুক এবং পাপী এমনকি কাফেরও হয়ে যেতে পারে। সকল নবী তাদের নবুঅতের দায়িত্ব পালনে সমান। কিন্তু এটা মহান আল্লাহ্র রহমত যে তিনি কাউকে কারও উপর ফযীলত দিয়েছেন। তদ্রূপ আমাদের রাসূলকে অন্য সকল রাসূলের উপর ফযীলত দিয়েছেন।

ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ :

একদা এক লোক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলল, হে সৃষ্টির সেরা মানুষ! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে তো ইবরাহীম। অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা মানুষ ইবরাহীম (আঃ)।[৮১]

যারা রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে তাদেরকে আগে এই হাদীছের জবাব দিতে হবে। কেননা এই হাদীছে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর উপর এবং সকল নবীর উপর ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রাধান্যকে মেনে নিচ্ছেন। এই হাদীছ একটা বড় দলীল যে, রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে কমবেশী আছে।

আমরা এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ঐ হাদীছ পেশ করতে চাই, যেখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বয়ং নিজেকে খায়রুল বারিইয়াহ বলেছেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

يَخْرُجُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ–

‘শেষ যামানায় কিছু মানুষ বের হবে যারা হবে অল্প বয়সী বোকা। তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কথা থেকে কথা বলবে তথা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনাবে। তাঁরা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাঁরা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর বের হয়ে যায় শিকার ভেদ করে’।[৮২]

এই হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) খায়রুল বারিয়্যাহ বা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এছাড়া আরও অনেক দলীল রয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার। কিন্তু এই হাদীছ বলছে ইবরাহীম (আঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ।

সালাফে ছালেহীন এই হাদীছের দু’ভাবে জবাব দিয়েছেন। ১. মানসূখ ২. ভদ্রতা ও সম্মানের জন্য।

মানসূখ : রাসূল (ছাঃ) আগে জানতেন না যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে যেভাবে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন,

৮১. মুসলিম, ‘ইবরাহীম (আঃ)-এর ফযীলত’ অধ্যায়।
৮২. বুখারী ‘নবুঅতের আলামত’ অধ্যায়, হা/৩৪১৫, তিরমিযী হা/২১৮৮।

তাকেও সেভাবে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এটাও জানতেন না যে, তিনি সকল আদম সন্তানের সরদার এবং ইবরাহীম (আঃ) ক্বিয়ামতের মাঠে তাঁর ঝাণ্ডার নীচে হবেন। এও জানতেন না যে, মহান আল্লাহ তাঁর আগের ও পিছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন। যখন জানতে পারলেন যে, তিনিই শ্রেষ্ঠ তখন আবার ঐ সমস্ত হাদীছ বলেন, যা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। যেমন নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

وأجاب العلماء عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعاً وهضماً لنفسه، أو أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأن الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، وأنه سيد الناس يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الأحاديث الصحيحة-

'আলেমগণ এই হাদীছের দু'ভাবে জবাব দিয়েছেন। হয় তিনি এটা সম্মান ও ভদ্রতার খাতিরে বলেছেন বা তিনি এই খবর জানার আগে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে যেভাবে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাকেও সেভাবে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ক্বিয়ামতের মাঠে আদম সন্তানের সরদার হবেন এবং আদম (আঃ) সহ সকলেই তাঁর ঝাণ্ডার নীচে হবেন। যেমন এই কথাগুলো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৮৩]

মানসূখ হওয়ার দলীল হ'তে পারে এই যে, এই হাদীছ আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এবং আদম সন্তানের সরদার হওয়ার হাদীছ আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর আবু হুরায়রা (রাঃ) অনেক পরে অর্থাৎ ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীছগুলো শেষের দিকের হাদীছ।

রাসূল (ছাঃ) আসলে ভদ্রতার কারণে অন্য কাউকে তাঁর সামনে তাঁর প্রশংসা করতে দিতেন না। এজন্যই তিনি যখনই তাঁর সম্মানের কথা জনগণের সামনে জানিয়েছেন তখনই বলেছেন, وَلاَ فَخْرَ 'আমি এই কথা গর্ব করত বলছি না'। বরং তোমাদেরকে দ্বীনের একটা বিষয় জানানোর জন্য বলছি, যেন তোমরা তার উপর ঈমান আন।[৮৪]

অবশ্য এই হাদীছ মানসূখ হ'লেও সম্পূর্ণরূপে মানসূখ নয়। কেননা এই হাদীছই দলীল যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও মানব হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ)। যেমন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, فَإِبْرَاهِيمُ أَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'ইবরাহীম (আঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর সৃষ্টির সেরা'।[৮৫]

সালাফে ছালেহীনের ঐক্যমত :

যুগ যুগ থেকে লালন করে আসা আক্বীদা যদি এমন হয়, তাহ'লে যারা আম জনসাধারণ তাদের আক্বীদার কোনও ভরসা নেই। কিন্তু সেই আক্বীদা যদি হয় কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সালাফে ছালেহীন দ্বারা প্রচারিত যুগ যুগ থেকে লালন করে আসা ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিছীনে ইযামের আক্বীদা, তাহ'লে তাতে ভুলের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বিশেষ করে যখন তা আক্বীদা সম্পর্কিত মাসাআলা হয়। কেননা একমাত্র আক্বীদার মাসআলাই এমন যাতে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন-এর কোন মতভেদ নেই।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এটা আক্বীদা সম্পর্কিত মাসাআলা। আর আক্বীদার অন্য মাসআলাগুলোর মত এই মাসআলাতেও সালাফে ছালেহীনের কোনও মতভেদ নেই। যেমন :

১. শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم صريح في تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع ولد آدم 'রাসূল (ছাঃ)-এর এই কথা যে, 'তিনি আদম সন্তানের সরদার' স্পষ্ট দলীল যে তিনি সকল আদম সন্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ'।[৮৬]

২. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) স্বীয় 'রিসালাহ' গ্রন্থে বলেন,

فكان خيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته وأعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الاولى والشافع المشفع في الأخرى-

'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ মুছত্বফা (ছাঃ) তাঁর অহি-র জন্য নির্বাচিত হওয়ার কারণে এবং এমন রিসালাতের জন্য যা সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র রহমতের কারণে ও খতমে নবুঅতের কারণে এবং তাঁর রিসালাতের বিশ্বব্যপ্তির কারণে, যা ইতিপূর্বে প্রেরিত কোনও নবীর ক্ষেত্রে ছিল না এবং দুনিয়াতে মুহাম্মাদের যিকর বা স্মরণকে স্বয়ং মহান আল্লাহ্র স্মরণের সাথে সম্পর্কিত করার কারণে এবং আখিরাতে তাঁকে প্রথম শাফা'আত ও প্রথম যার শাফা'আত গৃহীত হবে এই মর্যাদা দানের কারণে'।[৮৭]

ইমাম ইবনে হাজার আল-হায়ছামী (রহঃ) বলেন, 'ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এখানে স্পষ্ট আকারে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন সেটার উপরই রয়েছেন সমস্ত ওলামায়ে কেরাম'।[৮৮]

৩. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ جَاهًا عِنْدَ اللَّهِ 'মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে মর্যাদাগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি'।[৮৯] তিনি الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطان গ্রন্থে বলেন,

৮৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪৪।
৮৪. ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৮, তিরমিযী হা/৩৬১৫।
৮৫. মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৭/৪৮৩।
৮৬. সিলসিলা যইফাহ হা/৫৬৭৮।
৮৭. ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ ১/১৩।
৮৮. আল-ফাতাওয়া আল-হাদীছিয়াহ ১/১৩৬, দারুল ফিকর।
৮৯. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, দারুল ওয়াফা, ১/১৪৫।

أَفْضَلُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ هُمْ أَنْبِيَاؤُهُ، وَأَفْضَلُ أَنْبِيَائِهِ هُمُ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ، وَأَفْضَلُ الْمُرْسَلِينَ أُولُو الْعَزْمِ : نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'আল্লাহ্র ওলী বা বন্ধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নবীগণ। নবীগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাসূলগণ। রাসূলগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন উলুল আযম বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাহসী পাঁচজন রাসূল। তারা হ'লেন নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এরপর ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَأَفْضَلُ أُولِي الْعَزْمِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'সর্বশ্রেষ্ঠ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাহসী পাঁচ জন রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)'। এই কথা বলার পর ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[৯০]

৪. শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) স্বীয় আক্বীদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বইয়ে উল্লেখ করেছেন, রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তারপর ইবরাহীম (আঃ), তারপর মূসা (আঃ), তারপর নূহ (আঃ), তারপর ঈসা (আঃ)।

৫. শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে তাঁর অন্য নবী ভাইদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোনও মতভেদ নেই'।

৬. ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর শরহে মুসলিম-এ 'আমি আদম সন্তানের সরদার' মর্মে বর্ণিত হাদীছের উপর এই নামে অধ্যায় রচনা করেছেন, باب تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ 'রাসূল (ছাঃ)-এর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব' অধ্যায়।

এরপর এই হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেন, وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيْلٌ لِتَفْضِيْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لِأَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْآدَمِيِّيْنَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْآدَمِيِّيْنَ وَغَيْرِهِمْ 'এই হাদীছ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠ হওয়ার দলীল। কেননা আহলুস সুন্নাহ-এর মাযহাব হচ্ছে, মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) সকল মানুষ ও অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ'।[৯১]

৭. ইমাম রাযী এই বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের ঐক্যমতের কথা উদ্ধৃত করেছেন।[৯২] সেখানে তিনি বলছেন, وَقَدْ حَكَى الرَّازِيّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ مُفَضَّلٌ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِيْنَ 'রাযী এই বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ'।

৮. ইমাম কুরতুবী বলেন, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء عليهم السلام 'কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী'।[৯৩]

৯. শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء 'নিশ্চয়ই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী'।[৯৪]

১০. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমার ফৎওয়া নং ২০৯৭২-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

অতএব যারা দলীল জানার পরেও রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল স্বীকার করবে না এবং সালাফে ছালেহীন-এর বিশ্বাস ও আক্বীদা পরিপন্থী বিশ্বাস ও আক্বীদা পোষণ করবে তাঁরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত থেকে বের হয়ে যাবে।

রাসূল (ছাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কিন্তু তিনি মানবতার উপরে নন। তিনি নূরের তৈরী নন এবং তিনি গায়েবের খবর জানতেন না। আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করা শিরক।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল স্বীকার না করা নতুন ফিৎনা। যারা একই দিনে ঈদ করার পক্ষে তারাই এই ফিৎনার উদ্ভাবক। এই ফিৎনা মুসলিম উম্মাহর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর যে সীমাহীন ভালবাসা আছে সেই ভালবাসাকে হ্রাস করে ইত্তিবায়ে সুন্নাহ-এর জাযবাকে খতম করার এক নতুন ষড়যন্ত্র। কেননা ইসলাম ধর্মের সম্পূর্ণ ভিত্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। তাঁর প্রতি উম্মতে মুসলিমার ভালবাসা ও সম্মান যত বাড়বে তত তাঁরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করবে। তাই ইহুদী-খ্রিস্টানরা সর্বদা চায় মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভালাবাসা দূরীভূত করে ফেলতে। বিশেষ করে তারা বলে, তাদের নবী ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) একই। সকলেই আল্লাহ্র নবী যেকোন একজনের আনুগত্য করলেই যথেষ্ট। এজন্য তাঁরা বলে থাকে যে, পবিত্র কুরআনে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নামের চেয়ে ঈসা (আঃ)-এর নাম অধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমানে অনেক মুসলিম ভাইও তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে প্রকারান্তরে তাদেরই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছেন ।

সালাফে ছালেহীন-এর বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছ না বুঝলে যে মানুষ পথভ্রষ্ট হ'তে বাধ্য তাঁর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এই মাসআলা। অতএব আসুন, আমরা শুধুমাত্র কুরআন অনুসরণ করব না। বরং কুরআন ও হাদীছ উভয়কেই মুক্তির দিশা হিসাবে গ্রহণ করব এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

৯০. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, আল-ফুরকান বায়না আওলিয়াইর রহমান ও আওলিইয়াইশ শায়তান, তাহক্বীক ও টীকা : আলী বিন নায়িফ আশ-শুহুদ, 'উলুল আযমদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ (ছাঃ)' অধ্যায়, ১/৮৩।

৯১. শরহে নববী, ১৫/৩৭, 'আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব' অধ্যায়।

৯২. ইমাম নববীর, মিনহাজুত তালেবীল-এর শারহ তুহফাতুল মুহতাজ-এর ভূমিকা, ১/১০০।

৯৩. সূরা নাহল ১২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৯৪. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায, ১/১৭৯।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(১৫তম কিস্তি)

যোগাযোগ, গোপনীয়তা, সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার

Article-12 : No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such enterference or attacks.[৯৫] 'কোন ব্যক্তির পরিবারের, বাসস্থানের চিঠি আদান-প্রদানের উপর কিংবা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের উপর অথবা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপর কোন ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না বা তার ব্যক্তিগত সম্মান এবং সুনাম ক্ষুণ্ন হ'তে পারে এমন কিছু করা যাবে না। যারা এসব বিষয়ে বিপত্তির শিকার হবেন তারা প্রচলিত আইনে প্রতিকার ও বিচার দাবী করতে পারবেন'।

অর্থাৎ জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের এই ধারায় মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় যেমন- পরিবার ও বাসস্থানের সাথে পরস্পর যোগাযোগের উপর এবং তার ব্যক্তিগত কোন গোপনীয়তার ওপর বাধা সৃষ্টি করা যাবে না অথবা ব্যক্তিগত সম্মান এবং সুনাম ক্ষুণ্ন হ'তে পারে এমন কিছু করা যাবে না। যদি কেউ তা করে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী উক্ত ভুক্তভোগী তার প্রতিকার পেতে পারেন। বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৪৩ ধারায় এ অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। যদিও অভিযোগকারীর জন্য এই সনদ অনুযায়ী প্রতিকারের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের এ ধারায় মানুষের ব্যক্তিগত কাজে পরিবারের সাথে যে কোন ধরনের যোগাযোগের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। পত্র যোগাযোগ সহ আধুনিক যুগের নানা প্রযুক্তিগত যোগাযোগের সুযোগও করে দেয়া হয়েছে। একই সাথে যে কোন মানুষের সুনাম ও সম্মান রক্ষা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলামে বহু পূর্বেই এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম এ অধিকার অর্জনের পথকে যেমন সহজ ও সুন্দর করেছে, তেমনি তা সুরক্ষার জন্য মানব সম্প্রদায়কে অত্যন্ত সতর্কতামূলক বাণী উচ্চারণ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে ভালবাসো? বস্তুতঃ তোমরা এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

এ আয়াতে মানুষের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান না করা এবং গীবত না করার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

একইভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে খারাপ নামে ডাকা অথবা কাউকে বিদ্রূপাত্মকভাবে ডাকা উচিত নয়; বরং এর পরিবর্তে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের সুনাম, মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যথাযথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে বিদ্রূপ না করে। কেননা তারা তাদের চেয়ে উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন বিদ্রূপ না করে, কেননা তারা তাদের চেয়ে উত্তম হ'তে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করে না তারাই অত্যাচারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

একে অপরের গৃহে প্রবেশ করার বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহ সমূহে প্রবেশ কর না, যে পর্যন্ত না তাদের অনুমতি গ্রহণ কর এবং তার বাসিন্দাদেরকে সালাম প্রদান কর। এই পন্থাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(নূর ২৪/২৭)*।

এ বিষয়ে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْهُ. 'মুসলিম তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হ'লে তারা অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না' *(নূর ২৪/৬২)*।

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৯৫. *Fifty years of Universal Declaration of Human Rights, P. 201*

ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত সুনাম ও সম্মান নষ্ট করা তো দূরের কথা বরং তা রক্ষা করার জন্য নিকট ও দূর আত্মীয়সহ সকলের সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً.

‘তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করবে। আল্লাহ দাম্ভিক ও আত্মগর্বীকে পসন্দ করেন না’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে উত্তম নামে ডাকা ইসলামের নির্দেশ। বরং মন্দ নামে ডাকতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন’ *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। কিন্তু দুর্ভাগ্য বর্তমান যুগে মর্যাদাবান মানুষকে আর সুনামের সাথে ডাকা হয় না; বরং দলীয় স্বার্থ পরিপন্থী হলে তাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী অথবা ইহূদীদের দালাল প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয় এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক সংবাদ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করা হয়। আবার কখনও জ্ঞানী-গুণীদেরকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বছরের পর বছর আটকিয়ে রাখা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে অনেককে মিথ্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হচ্ছে। এসব মানবাধিকার পরিপন্থী। নবী-রাসূলগণকেও এভাবে মন্দ নামে আখ্যায়িত করা হ’ত। নূহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। যেমন তিনি (নূহ) বলেন, قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُوْنِ، فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও। আর আমার ও আমার সঙ্গে যেসব মুমিন আছে তাদের রক্ষা কর’ *(শু‘আরা ২৬/১১৭-১১৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাফির-মুশরিকরা মিথ্যাবাদী, যাদুকর, পাগল, কবি প্রভৃতি উপাধি দিয়েছিল। এখনও তাদেরই দোশররা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে কার্টুন, ছবি এঁকে তাঁকে ন্যাক্কারজনকভাবে চিত্রিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। মুসলিম নামধারী ব্যক্তি, ইহুদী-খৃষ্টান অথবা মুশরিকরা কখনও ধর্ম, কখনও বা অধর্মের নামে, কখনওবা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, কখনও রাজনীতির নামে রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা অ্যাখ্যা ও খেতাব দিয়ে যাচ্ছে। যা মানবাধিকার পরিপন্থী।

রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তোমরা যদি মানুষের গোপনীয় বিষয়াদি উদঘাটনে লেগে যাও তবে তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিবে কিংবা অন্তত ধ্বংসের পর্যায়ে পৌঁছে দিবে’।[৯৬]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, ‘তোমরা এক জায়গায় তিন জন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু’জনে কোন কথা বলবে না, যতক্ষণ না তোমরা বেশী সংখ্যক মানুষের সাথে মিশে যাও। কেননা তা করা হ’লে তৃতীয় ব্যক্তি চিন্তান্বিত হয়ে পড়তে পারে’।[৯৭] এরূপ নিষেধ করার কারণ হ’ল এতে একজনের মানবাধিকার উপেক্ষিত হয়। যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। তেমনি কাউকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে সেখানে বসা মানবাধিকারের লংঘন। এটা রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ, ‘একজনকে তার আসন থেকে তুলে সেখানে অন্য একজনকে বসতে নিষেধ করেছেন’।[৯৮]

একদা বিশিষ্ট সাহাবী আবু যার ও বেলাল হাবাশী (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে পরস্পরকে গাল-মন্দ করলেন এবং রাগের মাথায় আবু যার বেলাল (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে কালোর সন্তান! অতঃপর বেলাল (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে অভিযোগ করলে রাসূল (ছাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে ধমক দিয়ে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ‘হে আবু যর! তুমি তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে’।[৯৯]

ইসলামে যেকোন ব্যক্তির সম্মান ও সুনাম রক্ষা করা একটা পবিত্র বিষয় যা অলংঘনীয়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের আজকের এই দিন এই মাস এই শহর পবিত্র’।[১০০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারো দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না এবং (বেচা-কেনায়) একে অপরেরকে ধোঁকা দিয়ো না। পরস্পরে হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব রেখো না, একজন থেকে আর একজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। বরং সবাই এক আল্লাহ্র বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[১০১]

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলমান কর্তৃক অন্যের সুনাম, মর্যাদাকে নষ্ট করা তো দূরের কথা; বরং সর্বদা সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকে যে, কখনও সে অন্যকে কষ্ট দিচ্ছে কি-না। যেমন হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, ‘আমার যতদূর মনে পড়ে আয়েশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাত তুলে দো‘আ করতে দেখেছেন। তিনি এই দো‘আ করছিলেন, اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَىُّ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ

---

৯৬. *আবু দাঊদ হা/৪৮৮৮, মিশকাত হা/৪৮৮৮।*

৯৭. *বুখারী হা/৬২৮৮, মুসলিম হা/২১৮৯।*

৯৮. *বুখারী হা/৬২৬৯, মুসলিম হা/২১৭৭, মিশকাত হা/৪৬৯৬।*

৯৯. *বুখারী হা/৩০, বায়হাক্বী শু‘আব হা/৪৭৭২, আলবানী, গায়াতুল মারাম, সনদ ছহীহ।*

১০০. *ইবনে মাজাহ, হা/৩০৫৫।*

১০১. *বুখারী হা/৬০৬৬।*

ضَرَبْتُ أَوْ آذَيْتُ فَلاَ تُعَاقِبْنِى بِهِ ‘হে আল্লাহ! আমি মানুষ, মানুষসুলভ দুর্বলতাবশতঃ আমি যদি তোমার কোন মুমিন বান্দাকে যদি কোনভাবে আঘাত দিয়ে থাকি বা কোনরূপ কষ্ট দিয়ে থাকি তবে এজন্য আমাকে শাস্তি দিও না’।[১০২]

তিনি সর্বদা মানুষের কল্যাণ বা হেদায়াত কামনা করেছেন। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, দাওস গোত্রের তোফায়েল ইবনে আমর রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! দাওস অবাধ্যতা ও আল্লাহ্র দ্বীনকে অস্বীকার করার পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য বদদো‘আ করুন। নবী করীম (ছাঃ) তখন কেবলামুখী হয়ে দো‘আ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় উঠালেন। লোকের ধারণা হ’ল যে, নবী করীম (ছাঃ) তাদের জন্য বদদো‘আ করবেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে আমার কাছে এনে দিন’।[১০৩]

সুতরাং ভাল-মন্দ সকল মানুষের প্রতি উদারতা ও দয়া দেখানো উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না’।[১০৪]

ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকের জন্য কারো আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কতটুকু এবং এই ক্ষেত্রে নাগরিকের অধিকার কতটুকু ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়। আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, একদা তিনি ওমর (রাঃ)-এর সাথে মদীনার প্রজা সাধারণের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য বের হ’লেন। হাটতে হাটতে হঠাৎ একটি বাড়ির মধ্যে প্রদীপ তাদের দৃষ্টিগোচর হল। অতঃপর তারা সেদিকে যেতে লাগলেন। তারা বাড়ির নিকটবর্তী হয়ে দেখলেন দরজা আটকানো একটি ঘরের মধ্যে একদল লোক রয়েছে এবং সেখানে উচ্চস্বরে আওয়াজ হচ্ছে। তখন ওমর (রাঃ) আব্দুর রহমানের হাত ধরে বললেন, তুমি কি জান এ বাড়ীটি কার? তিনি বললেন, না। ওমর (রাঃ) বললেন, এ বাড়ীটি রাবী‘আহ বিন উমাইয়া ইবনে খালাফের। হয়তো তারা মদ পান করছে, তুমি কি মনে কর? আব্দুর রহমান বললেন, আমি মনে করি, আমরা আল্লাহ্র নিষেধকৃত পন্থায় এখানে এসেছি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে নিষেধ করে বলছেন, ‘তোমরা গোয়েন্দাগিরি কর না’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। অথচ আমরা গোয়েন্দাগিরি করছি। একথা শুনে ওমর (রাঃ) তাদের ছেড়ে ফিরে আসলেন।[১০৫]

খলীফা ওমর (রাঃ)-এর যুগের অপর একটি ঘটনা। ইমাম শা‘বী (রহঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, জাহেলী যুগে আমি আমার কন্যাকে জীবন্ত কবরস্থ করেছিলাম। কিন্তু পরে (মারা যাওয়ার পূর্বেই) তাকে বের করেছিলাম। পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করে। একসময় (অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ায়) তার উপর হদ আবশ্যক হ’ল। অতঃপর সে একটি চাকু নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। আমি তাকে কণ্ঠনালীর কিছু শিরা কর্তিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। ফলে সে বেঁচে গেল এবং ধার্মিক হয়ে গেল। পরে সর্বদা সে কুরআনী বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা শুরু করল। এখন সে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করছে। এক্ষণে আমি কি তার পূর্ববর্তী ঘটনা প্রকাশ করব? তখন ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি এমন একটি বিষয় প্রকাশ করতে চাও, যা আল্লাহ গোপন রেখেছেন? আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি তার ঘটনা কিছু প্রকাশ করেছ, তাহ’লে তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করব। বরং তুমি তাকে একজন পূতপবিত্র মুসলিম রমণীর ন্যায় বিবাহ দাও।[১০৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে বুশর (রাঃ) বলেন, ‘যখন কারো দ্বারপ্রান্তে কোন ব্যক্তি উপনীত হবে এবং অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন একেবারে দরজার মুখোমুখি দাঁড়াবে না, বরং একটু ডান পাশে বা বাম পাশে সরে দাঁড়াবে। যদি অনুমতি দেয়া হয়, তবে ঢুকবে, নতুবা চলে যাবে’।[১০৭]

শুধু তাই নয় ঘরে প্রবেশের অনুমতির পূর্বে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও নিষিদ্ধ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কোন মুসলিমের জন্য অনুমতি পাওয়ার পূর্বে কোন গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়’।[১০৮]

কেউ যদি কারো ঘরে উঁকি মারে তাহ’লে তার চোখ ফুটা করার কথা হাদীছে এসেছে। কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার কারণে তার গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়, যা প্রকারন্তরে মানবাধিকারের পরিপন্থী।

পর্যালোচনা : জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১২ নং ধারায় মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগাযোগের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, তেমনি সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করার অধিকারেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামও এ বিষয়ে বহু বছর পূর্বে সুন্দরতম ব্যবস্থা দিয়েছে; যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতি থেকে সহজে অনুমেয়।

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, মোবাইল প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগের নামে তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া মানুষের পারিবারিক জীবন সহ গোটা সমাজ ব্যবস্থা এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। যা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে মানুষের যোগাযোগ মাধ্যমে বিঘ্ন ঘটলে ও তাদের সুনাম-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হ’লে সে তার প্রতিকারের দাবী করতে পারে। তবে সে দাবীর প্রেক্ষিতে কি

---

১০২. আহমাদ, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১০।
১০৩. বুখারী হা/৬৩৯৭।
১০৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭।
১০৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/১৮৯৪৩; হাকেম হা/৮১৩৬, যাহাবী ছহীহ বলেছেন।
১০৬. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৬৯০, মুসনাদুল হারেছ হা/৫০৭, সনদ মুরসাল।
১০৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭৮, সনদ হাসান।
১০৮. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১০৯৩।

প্রতিকার পাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলা নেই। আর এ সকল অধিকার যারা লংঘন করে তাদেরও কেমন বিচার হ'তে পারে তারও কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হ'ল মানবাধিকার রক্ষার দাবীদার (?) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অন্যান্য রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধানগণের টেলিফোন ও যোগাযোগের ওপর আঁড়ি পাতার ঘটনা। এর উদ্দেশ্য হ'ল তাঁরা কোথায়, কার সাথে কথা বলছে, কেন যোগাযোগ করছে সকল গোপন খোঁজ-খবর নেয়া। এতে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্র রাষ্ট্রগুলো যেমন ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স সহ অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ মনঃক্ষুণ্ন হন। অনাকাঙ্খিত ও অযৌক্তিক এই হস্তক্ষেপে বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চরম সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেন। শুধু তাই নয়; মানবাধিকার কর্মীদের মতে, এটা নিঃসন্দেহে মানবাধিকার পরিপন্থী কাজ, যাতে আলোচ্য ধারা লংঘিত হয়েছে। অথচ এর কোন শাস্তি নেই। বিশ্বের কোন গরীব রাষ্ট্র যদি এরকম কাজ করতো তাহ'লে হয়ত শাস্তি হ'ত। কিন্তু ধনী-গরীব ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যেই হৌক না কেন এ ধরনের সুযোগ ইসলামে নেই।

বর্তমান যুগের কোন সম্মানী মানুষ তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হ'লে তো কথাই নেই। এরপর যুলুমবাজরা তাঁর অর্জিত ব্যক্তিগত মর্যাদা ও সুনামকে মুহূর্তের মধ্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। যেমন- এদেশে যখন যে সরকার আসে তারা ভিন্ন মতালম্বী আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে নানাভাবে নির্যাতন করে থাকে। আর এর সাথে সহযোগী হিসাবে যুক্ত হয় সরকারী গোয়েন্দা বাহিনী, সংবাদকর্মী, ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি সংস্থার মিথ্যা রিপোর্ট পেশের মাধ্যমে মানসিক নির্যাতন করে থাকে। এসব জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ১২ নং ধারা এবং বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ৪৩ ধারানুযায়ী তারা নিঃসন্দেহে মানবাধিকার লংঘন করছে। দুনিয়াতে তাদের বিচার না হ'লেও আল্লাহ্‌র দরবারের বিচার থেকে কেউ নিস্কৃতি পাবে না।

ইসলাম এসব সমর্থন করে না। কারো অপরাধ প্রকাশিত হ'লে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তার মর্যাদার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করে নয়। রাসূল (ছাঃ) কোন ত্রুটিযুক্ত মানুষকে যেমন- খোড়া, বেটে, কানা, ল্যাংড়া প্রভৃতি নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এমনকি ইহুদী, খৃষ্টান বা অন্য ব্যক্তি-জাতিকেও কটাক্ষ বা বিদ্রূপ করে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ ইসলাম সাম্যের ধর্ম, পরস্পরের মর্যাদা ও গোপনীয়তা রক্ষার ধর্ম। এটা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মত নয়।

মোদ্দাকথা জাতিসংঘের এই ধারা শুধু আইনেই লেখা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এর যেমন প্রয়োগ নেই, তেমনি যদি কেউ লংঘন করে তার শাস্তির প্রকৃতি কেমন হবে তারও কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং জাতিসংঘ সনদের উক্ত ধারা ভাষাগত দিকে কিছুটা তুলে ধরলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব কোন লক্ষণ নেই, যা ইসলামে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, মুসলমানরা কেবল মানুষের ভয়ে এই মানবাধিকার ও অন্যান্য মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেন না; বরং তারা যা করেন একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই করেন। ফলে এ বিষয়ের কোন পরিবর্তন, সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এটা শাশ্বত, চিরন্তন ও সার্বজনীন। সুতরাং বিশ্বের বুকে যদি মানুষকে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ, গোপনীয়তা রক্ষা, সুনাম ও মর্যাদা রক্ষার জন্য কোন সনদ এবং স্থান খুঁজতে হয়, তাহ'লে তাকে ফিরে আসতে হবে ইসলামের পতাকা তলে। যা মানবাধিকারের একমাত্র গ্যারান্টি। *[চলবে]*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সমৃদ্ধ প্রকাশনা সৃষ্টির জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ নিবেদিত প্রাণ গবেষক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রয়োজন :

(১) একদল নিবেদিতপ্রাণ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু গবেষক ও লেখক, যারা নিজেদের গবেষণা ও লেখনী শক্তিকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে চান।

(২) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং প্রকাশনা সমূহ স্বল্পমূল্যে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান।

সর্বোপরি উপরোক্ত স্বপ্ন পূরণে আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি। যিনি চাইলে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

যোগাযোগের ঠিকানা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫ মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩৮৫২ ইসলামী ব্যাংক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

মোদীর বিজয়ে ভারত কী হারাল?

*উইলিয়াম ডালরিম্পল**

মোদী একজন শক্তিমান বক্তা। গত কয়েক মাসে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছেন, এমনকি তিনি পূজনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদে যারা বিশ্বাস করেন না, তারাও মোদীর প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ হচ্ছে, তাঁর কর্মসূচীতে ভারতের ৩০০ মিলিয়ন মধ্যবিত্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তা হ'ল দেশটির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। তাঁর নেতৃত্বে গুজরাটের অর্থনীতি ২০০১ সালের পর আকারে তিন গুণ বেড়েছে। সে কারণেই ২০০১ সালের পর থেকে তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অপরিসীম। কাজ করিয়ে নিতে ও বিনিয়োগ আনতে তিনি পারঙ্গম। দুর্নীতিও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে, আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। অচল ও ঝামেলাপূর্ণ নিয়মকে ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন তিনি।

ভারতের মানুষ আরো পাঁচ বছর কংগ্রেস শাসনে থাকতে চায় না কেন, সেটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে মোদীর অবস্থান ও পুরনো রেকর্ড জানার পরও মানুষ তাঁকে নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত কেন, তা বোঝা অতটা সহজ নয়।

২০০২ সালে মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, সে সময় প্রায় দুই হাযার মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মৃত্যুবরণ করে। আরো প্রায় দুই লাখ মুসলিম ঘরছাড়া হয়। অনেক মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়, পুরুষদের কেটে টুকরো টুকরো করা হয় এবং কেরোসিন দিয়ে বা জ্বলন্ত টায়ারে পুড়িয়ে মারা হয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের পেট চিরে তাঁদের চোখের সামনে ভ্রূণ হত্যা করা হয়। মোদী নিজের ব্যবহারিক প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে গর্ব করলেও তাঁর বিরুদ্ধে ২০০২ সালের দাঙ্গা সংঘটিত হতে দেওয়ার অভিযোগ আছে। এমনকি দাঙ্গাবাজদের গ্রেপ্তার না করার জন্যও নাকি তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদিও এ অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, মোদীর প্রশাসন এই হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা করেছে। 'এটা ছিল পরিকল্পিত আক্রমণ'। ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন জ্যেষ্ঠ গবেষক বলেছেন, 'এটা সংঘটিত হয়েছে পুলিশ ও রাজ্য সরকারের কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায়'।

মোদী বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক তদন্তের মুখোমুখি হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন রায় হয়নি। এমনকি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদানে তাঁর সরকার ব্যর্থ হলেও তিনি কখনোই ক্ষমা প্রার্থনা করেননি বা তাঁর মধ্যে কোন অনুশোচনাও দেখা যায়নি। দাঙ্গাবিষয়ক প্রশ্ন করা হলেও তিনি এর উত্তর দিতে অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে গত বছর তিনি মন্তব্য করেন, 'একটি কুকুরছানা গাড়িচাপা পড়লে' আমি যেমন দুঃখিত হতাম, দাঙ্গায় মুসলমানদের দুর্দশায় ঠিক তেমন কষ্ট পেয়েছি। একবার তিনি দাঙ্গাবাজদের কর্মকাণ্ডকে আংশিকভাবে যৌক্তিকও বলেছিলেন। যেমন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'নয়-এগারো পরবর্তীকালে নিরপরাধ শিখ নিহত হয়েছিল, কেন? কারণ সে দেখতে সন্ত্রাসীদের মতো ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত মানুষদের যদি উসকানি দিয়ে এ কাজ করানো সম্ভব হয়, তাহলে গুজরাটের মানুষদের ক্ষেত্রে কেন ভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে?' আরও একবার এর চেয়েও শীতল কণ্ঠে তিনি ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছিলেন, 'কেন ২০০২ সাল নিয়ে এত কথা হচ্ছে?... এটা অতীত, এর কী তাৎপর্য আছে?' নিউইয়র্ক টাইমসকে তিনি বলেছিলেন, তাঁর একমাত্র আক্ষেপ হচ্ছে, তিনি মিডিয়াকে সামলাতে পারেননি।

এসব বক্তব্যে ভারতীয় মুসলমানরা আশ্বস্ত হননি, উদার হিন্দুদেরও তা আশ্বস্ত করতে পারেনি। এই ঘরানার মানুষ ভারতের বহুত্ববাদী সমাজকাঠামোর ওপর ভরসা রাখে। মোদীর দলের মুসলমানবিরোধিতাও কমেনি: সেই দাঙ্গার শিকার ৫০ হাযার মানুষ এখনো অতিদারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে, উদ্বাস্তু হয়ে তারা ৮৩টি 'শরণার্থী শিবিরে' পচে মরছে। মোদী একবার এসব শিবির পরিদর্শন করলেও তিনি তাচ্ছিল্যভরে এসব শিবিরকে মুসলিম 'শিশু উৎপাদন শিবির' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। নির্বাচনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় তিনি বারবার মুসলিম টুপি পরতে অস্বীকার করেন। তাঁর ভাষায়, 'এর মানে হবে সংখ্যালঘুদের তোয়াজ করা'।

১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙার সঙ্গেও মোদীর সম্পর্ক আছে। তার আগে ১৯৯০ সালে সোমনাথ মন্দির থেকে রথযাত্রা আয়োজনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই রথযাত্রায় যে প্রচারণা চালানো হয়, সেটাই পরবর্তীকালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে প্ররোচনা দেয় বলে অভিযোগ আছে। মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হন ২০০১ সালের সাত অক্টোবর। চার মাস পরেই গোধরা স্টেশনে ৫৯ জন তীর্থযাত্রী ট্রেনে আগুন লেগে পুড়ে মারা যান। কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই মোদী বলে বসেন, এটা পাকিস্তানের মুসলমানদের ষড়যন্ত্র। তিনি রাজ্যব্যাপী হরতাল ডেকে বসেন। আর আগুনে পোড়া তীর্থযাত্রীদের মরদেহ নিয়ে মিছিল করেন। উত্তেজক বক্তৃতাও দেন তিনি।

তার পরের দিন জঙ্গী হিন্দুদের একটি বিশাল দল নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুজরাটের অভিজাত মুসলিম আবাসিক এলাকা গুলবার্গের সামনে জড়ো হয়। সেখানে থাকতেন কংগ্রেসের সাবেক সাংসদ এহসান জাফরী। পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখে জাফরী আতঙ্কিত হয়ে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে ফোন করতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে মোদীও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জাফরী নিরাশ হয়ে পড়েন। সে সময় জাফরীর বাড়িতে ইমতিয়ায পাঠান নামের একজন বিদ্যুৎমিস্ত্রি আশ্রয় নেন।

* *'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার ভারতীয় প্রতিনিধি।*

ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকায় তিনি বলেন, 'আমি যখন জাফরী সাহেবকে বলি, কী হয়েছে; 'তিনি বলেন, কোন পুলিশ মোতায়েন করা হবে না।' জাফরীর বিধবা স্ত্রী যাকিয়ার ভাষ্য অনুসারে, মোদী তাঁর স্বামীকে বিদ্রূপ করে বলেন, জাফরী এখনো বেঁচে আছেন শুনে তিনি বিস্মিত।

এর কিছুক্ষণ পরেই জাফরীর স্ত্রী ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আতঙ্ক নিয়ে দেখেন, দাঙ্গাবাজরা তাঁর স্বামীকে দিগম্বর করে টেনে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। তার চোখের সামনেই তারা জাফরীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে একে একে তাঁর আঙুল, হাত, পা, মাথা কেটে টুকরো টুকরো করছে। তারপর জাফরীর মৃতদেহকে তারা একটি উন্মুক্ত চিতায় স্থাপন করে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেও কিছু করেনি। এমনকি জাফরীকে পুলিশ বলে, 'আপনাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আমাদের ওপর কোন নির্দেশ নেই'। পরবর্তীকালে একটি ম্যাগাজিনের তদন্তে কয়েকজন দাঙ্গাবাজকে ক্যামেরার সামনে বলতে শোনা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী এই আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। মোদী আমাদের তিন দিন সময় দিয়ে বলেছেন, 'এর মধ্যে যা পার করো', দাঙ্গাবাজদের একজন গর্বভরে বলেন।

মোদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুতর। কিন্তু তিনি যথারীতি সব অভিযোগ অস্বীকার করেন, এমনকি এও বলেন, সেদিন রাত সাড়ে আটটার আগে তিনি এ ঘটনা জানতেনই না। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমও (এসআইটি) তাঁর এই ভাষ্য সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

তবে এই এসআইটির প্রতিবেদনে অনেক অসংগতি আছে। ফলে এটা গ্রহণ করা কঠিন। যেমন, ঘটনার দিন দাঙ্গা শুরু হলে গুলবার্গে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বহুবার যোগাযোগ হয়েছে, সে রেকর্ড আছে।

এই প্রতিবদনে মোদীর প্রশংসা করে বলা হয়েছে, সেদিন তিনি বারবার পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কী করে জাফরীকে খুনের ঘটনাটি রাতে জানলেন? ফলে প্রতিবেদনটি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে।

বিশেষত মোদীর একজন সাবেক সহকারী যখন একটি এফিডেভিটের বরাত দিয়ে বলেন, গুজরাটের আইনজীবীদের কাছে ঐ প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা এটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখেন, এমনকি এর সম্পাদনাও করেন।

ভারতের জনগণ একটি মারাত্মক জুয়া খেলায় মেতে উঠেছে। তারা মোদীর মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতাবিষয়ক অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে তাঁর মধ্যে একজন শক্তিশালী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছেন। যিনি হয়তো কিছু কঠিন সংস্কার করতে পারবেন, সুশাসনও কিছুটা নিশ্চিত করতে পারবেন। এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও হয়তো আসবে। কিন্তু তার বদলে ভারতীয়রা কী হারাল, সেটা তাদের ভেবে দেখা দরকার। *॥ সংকলিত॥*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বক্তব্য, সভা-সম্মেলন, পত্র-পত্রিকা, বইপত্র, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সমাজকল্যাণ মূলক তৎপরতা প্রভৃতির মাধ্যমে এ বিশুদ্ধ দাওয়াতকে জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে একদল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন আল্লাহভীরু মানুষ তৈরী করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত একাধিক মারকায ও মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু এ কার্যক্রমকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন একদল ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-দাঈ ও পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা। যার অভাবে আজও পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বপ্নের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি। এক্ষণে আমাদের একান্ত প্রয়োজন :

(১) **একদল নিবেদিতপ্রাণ যোগ্য দাঈ ও শিক্ষক** : যারা আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তোলাকে নিজেদের জন্য পরকালীন পাথেয় হিসাবে গণ্য করেন এবং এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন।

(২) **পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদান**। যার মাধ্যমে আমরা রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলিতে একটি করে বৃহদাকার মারকায এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ সহ প্রত্যেক যেলায় দাওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মারকাযগুলির সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হই।

উপরোক্ত স্বপ্ন পূরণে আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি। যিনি চাইলে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

যোগাযোগের ঠিকানা

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭।

শিক্ষা কার্যক্রমের একাউন্ট নং

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নম্বর ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

দাওয়াহ কার্যক্রমের একাউন্ট নং

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

আহলেহাদীছ ফিৎনা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কোর্স!

বিগত দিনসমূহে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার সহযোগী ও সমমনা লেখক ও বক্তাদের লেখনী ও বক্তৃতাসমূহের মাধ্যমে এবং সুসংগঠিত দাওয়াতের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বাংলাভাষী মুমিন নর-নারীদের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার যে চেতনা ও জাযবা সৃষ্টি হয়েছে এবং দলে দলে মানুষ যেভাবে এ দাওয়াত কবুল করে ধন্য হচ্ছে, সেই পবিত্র স্রোতকে রুখে দেওয়ার জন্য বিরোধীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি তাদের একটি নতুন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে **'প্রশিক্ষণ কোর্স'** নামে। উদ্যোগটা খুবই ভাল ছিল, যদি নেগেটিভ লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত না হ'ত। উক্ত মর্মের দাওয়াতনামাটি হুবহু নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

'লা-মাযহাবী, তথাকথিত আহলে হাদীস ফিৎনা প্রতিরোধে পথ ও পন্থা এবং ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক তিন দিন ব্যাপী

প্রশিক্ষণ কোর্স

মুহতারাম
জনাব খতীব/ইমাম সাহেব

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

বাদ সালাম মসনুন, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, যুগে যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী অপশক্তির বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সময়ে লা-মাযহাবী-গাইরে মুকাল্লিদ, তথাকথিত আহলে হাদীস ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তেমনি একটি ভয়ঙ্কর ফিৎনার নাম। যে ফিৎনার মূল লক্ষ্যই হলো আহলে হক উলামায়ে কেরাম এবং আকাবের-আসলাফ থেকে মুসলিম জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মবিমুখ করা। ভয়াবহ এ ফিৎনা সম্পর্কে সর্বস্তরের মুসলমানদের অভিহিত করতঃ এই ফিৎনা থেকে রক্ষা করা আহলে হক উলামায়ে কেরামের ঈমানী দায়িত্ব। যা সময়ের অপরিহার্য দাবীও। এই ফিৎনার মোকাবেলা করতে হলে জানতে হবে তাদের উদ্ভট, বানোয়াট দাবী ও দলীলের দাঁতভাঙ্গা জবাব এবং এই ফিৎনা প্রতিরোধের সঠিক পথ ও পন্থা।

এ লক্ষ্যে দেশের উলামায়ে কেরাম, মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতীবগণের জন্য আগামী ২৭, ২৮, ২৯ মার্চ ২০১৪ইং বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার প্রত্যহ বাদ আসর হতে রাত দশটা পর্যন্ত মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় 'লা-মাযহাবী ফিৎনা প্রতিরোধে পথ ও পন্থা এবং ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক তিন দিন ব্যাপী 'প্রশিক্ষণ কোস' অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআলাহ।

এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন দারুল উলূম দেওবন্দের স্বনামধন্য ফাজিল, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাপী গাইরে মুকালিদ ফিৎনা প্রতিরোধের সফল প্রশিক্ষক ও মুনাযির হযরতুল আলাম মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ মাসূম সাকিব মুরাদাবাদী কাসেমী (দা.বা.)। এতে আপনি ও মসজিদের খতীব ও ইমাম সাহেবসহ যথাসময়ে অংশগ্রহণ করতঃ গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে অবগতি লাভ করায় সচেষ্ট হবেন বলে আমরা আশাবাদী।

সালামান্তে

মুফতী আব্দুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

[বিঃদ্রঃ এই বিশেষ দাওয়াতনামা শুধুমাত্র ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত ইমাম ও খতীব সাহেবদের জন্য প্রযোজ্য]

উপরের দাওয়াতনামায় স্পষ্ট যে, মুফতী ছাহেবরা বড়ই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমরা সবাইকে করজোড়ে নিবেদন করব, অহেতুক যিদ ও হঠকারিতা করবেন না। বরং নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করে নিন। সত্যকে কবুল করে নিন। অন্যকেও সত্য কবুলে উদ্বুদ্ধ করুন। তাতে দুনিয়া ও আখেরাতে আপনারা ভাল থাকবেন। নইলে আপনার কারণে যদি কেউ সত্য কবুলে বিরত থাকে, তাহ'লে কিয়ামতের দিন আপনাকেই দায়ী হতে হবে এবং অন্যদের বোঝা আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে।

ইসলামের নামে আপনাদের মাযহাবী রাজনীতিকরা সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের নেতৃবৃন্দের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারা নির্যাতন করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের সভাগুলি আপনারা দলীয় লোকদের দিয়ে ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে বাধা দিচ্ছেন। নতুন আহলেহাদীছদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছেন। সমাজচ্যুত করছেন। দৈহিক নির্যাতন করছেন। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল খাটানোর চেষ্টা করছেন। এখন আবার ইমাম ও খতীবদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এটাই কি আপনাদের দ্বীনী দায়িত্ব! দেশের হাযার হাযার মানুষ বেদ্বীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকি নাস্তিক, মুরতাদ ও খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে, তাদের রক্ষার জন্য আপনাদের কোন প্রশিক্ষণ কোর্স তো দেখা যায় না! কেউ খৃষ্টান হলে আপনারা তো ক্ষিপ্ত হননা। অথচ একজন মুমিন ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল শুরু করলেই আপনারা ক্ষিপ্ত হন কেন? এভাবে কি সত্যসেবী মুমিনকে ঠেকানো সম্ভব? কখনোই সম্ভব হবে না ইনশাআল্লাহ। অতএব হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে পরস্পরে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করুন। নিজেদের বানানো মাযহাবী বেরিকেড ভেঙ্গে সালাফে ছালেহীনের সহজ-সরল পথে ফিরে আসুন। সঠিক দ্বীনের নামে দ্বীনদারদের দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দিবেন না। আসুন সবাই আমরা প্রকৃত অর্থে ভাই-ভাই হয়ে যাই! তাতে সমাজে সত্যিকারভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আপনাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করতে চাই। যেখানে তিনি বলেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*।

'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী (রহঃ) 'নাজী' ফেরক্বা হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। তাদেরদের সেই লক্ষণ হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না' *(আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর: ১৩৪৬ হিঃ ১/৯০ পৃঃ)*।

আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে পরকালে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেলা মানসেহরা। এই মানসেহরারই একটি তহসিল হ'ল ঐতিহাসিক বালাকোট শহর। উপমহাদেশের প্রথম বৃটিশবিরোধী জিহাদ আন্দোলনের সর্বশেষ যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে বালাকোট উপত্যকা এক অমর রক্তাক্ত স্মৃতি বহন করে চলেছে। বিশেষ করে বালাকোটের পর্বতময় প্রান্তরে বৃটিশ-শিখবিরোধী জিহাদ আন্দোলনের দুই প্রাণপুরুষ বীর মুজাহিদ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর মর্মান্তিক আত্মত্যাগের ইতিহাস উপমহাদেশের প্রতিটি ঈমানদারের হৃদয়কে প্রতিনিয়ত আলোড়িত করে। কেবল তা-ই নয়, তাদের বিয়োগব্যথার অশ্রুবিন্দু অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়ে আজও পর্যন্ত উপমহাদেশের প্রতিটি ইসলামী বিপ্লবকামী মুসলিমের বুকে মরণজয়ী সংগ্রামের ক্ষীপ্র সলতে জ্বালিয়ে রেখেছে। গত ২৫.০৪.২০১৪ তারিখে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থানরত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সাবেক গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ঐতিহাসিক এই শহরটি সফর করেন। এ সময় তিনি বালাকোটে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম ও খত্বীব এবং গত কয়েক দশকে বালাকোট অঞ্চলে আহলেহাদীছ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে মূল ভূমিকা পালনকারী মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক মুযাফ্ফরাবাদীর (৬২) সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উর্দূ ভাষায় গৃহীত মূল সাক্ষাৎকারটি ঈষৎ সংক্ষেপায়িত আকারে প্রকাশিত হ'ল-সম্পাদক]

আত-তাহরীক : মুহতারাম আপনার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক মুযাফ্ফরাবাদী : ধন্যবাদ, আমি মূলতঃ আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুযাফ্ফরাবাদে জন্মগ্রহণ করি ১৯৫২ সালে। আমার পিতামহ হানাফী হ'লেও মাতামহ ছিলেন আহলেহাদীছ। ছোটবেলায় আমি বেড়ে উঠেছিলাম হানাফী হিসাবে। শৈশবে ও কৈশোরে স্কুলে পড়তাম। ফলে সে সময় দ্বীনী বিষয়ে তেমন ধারণা ছিল না। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে অধ্যয়নকালে সর্বপ্রথম দ্বীন সম্পর্কে এবং হানাফী-আহলেহাদীছ বিষয়ক দ্বন্দ্বগুলো জানার সুযোগ পাই। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যা কিছু শুনেছিলাম তাতে আহলেহাদীছ সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা জন্মেছিল। স্বভাবতঃই আহলেহাদীছদেরকে খুব ঘৃণার চোখে দেখতাম। মুযাফ্ফরাবাদে তখন অনেক আহলেহাদীছ পরিবার বসবাস করত। তাদের কিছু মসজিদও ছিল। কিন্তু তাদের সাথে কখনই মিশতাম না। একদিনের ঘটনা– এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে মিশকাত শরীফের অনুবাদ দেখে পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে লক্ষ্য করলাম ছালাতের অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছগুলোর সাথে আহলেহাদীছদের আমলের মিল রয়েছে। বিষয়টি আমার মধ্যে প্রথম চিন্তার সূত্রপাত করল। আমার এক নিকটাত্মীয় দেওবন্দী আলেমের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে আহলেহাদীছদেরকে এমন যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি-গালাজ করতে লাগলেন যে, আমি তার আচরণে হতবাক হয়ে গেলাম। আমার মনে হ'ল এ বিষয়ে আমাকে আরো জানতে হবে। তখন থেকেই আমি আহলেহাদীছ আক্বীদা বিষয়ে একটু একটু করে জানতে শুরু করি। আল-হামদুলিল্লাহ যতই জানতে থাকি ততই সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হ'তে থাকে। এক পর্যায়ে স্কুল ছেড়ে মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। চলে আসি রাওয়ালপিণ্ডির 'জামে'আ সালাফিইয়াহ' মাদরাসায় এবং এখানে টানা কয়েক বছর অধ্যয়নের পর ১৯৭৭ সালে দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করি।

আত-তাহরীক : আপনি বালাকোটে সর্বপ্রথম কখন এসেছিলেন? আপনার জন্ম মুযাফ্ফরাবাদে এবং পড়াশোনা রাওয়ালপিণ্ডিতে, তাহ'লে বালাকোটে আসার যোগসূত্রটা কি ছিল?

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : রাওয়ালপিণ্ডির 'জামে'আ সালাফিইয়াহ' মাদরাসাটি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ কর্তৃক পরিচালিত হ'ত। আমি ফারেগ হওয়ার পর জমঈয়তের দায়িত্বশীল মিঞা নাঈমুর রহমান তাহের লাহোরীর পরামর্শে মারকাযী জমঈয়ত অফিস থেকে আমাকে বালাকোটে একটি আহলেহাদীছ মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়। আমি তখন সদ্য লেখাপড়া শেষ করেছি ও নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। বালাকোটের মত এমন প্রত্যন্ত এলাকায় আসার জন্য মানসিকভাবে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু দায়িত্বশীলদের নির্দেশে অনেকটা বাধ্য হয়ে এখানে আসলাম। এটা ছিল ১৯৭৭ সালের ঘটনা।

আত-তাহরীক : বালাকোটে এসে কিভাবে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছিলেন এবং মসজিদ নির্মাণের কাজটি কখন শুরু হয়?

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : বালাকোট বাজারের কেন্দ্রস্থলে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে এই জমিটি সর্বপ্রথম জমঈয়তের উদ্যোগে কেনা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। গিলগিতের জনৈক আহলেহাদীছ ব্যক্তি গোলাম হায়দার নিজ অর্থে জমিটি ক্রয় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মসজিদ আবাদ করার মত কোন লোক এখানে ছিল না। খালি অবস্থায় জায়গাটি পড়ে ছিল প্রায় ১৫ বছর যাবৎ। ১৯৭৭ সালে বালাকোটে প্রথম আসার পর দেখলাম একেবারে শূন্য অবস্থা। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম মৌলভী ইদরীস (ক্বারী সাঈদের পিতা যিনি ২০০৫ সালের ভূমিকম্পে নিহত হন) নামের জনৈক বৃদ্ধ আছেন যিনি আহলেহাদীছ এবং জামায়াতে ইসলামীর রোকন। তিনি তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। আমি তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য পরামর্শ চাইলাম। একদিন তাঁকে অস্থায়ী বেড়া দিয়ে ঘেরা মসজিদে নিয়েও আসলাম। কিন্তু কোনও লাভ হ'ল না। উপরন্তু তিনি মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে ওলট-পালট কিছু কথা শুনালেন। আহলেহাদীছের নামে মসজিদ বানালে এখানে ফেৎনা সৃষ্টি হবে–এটাই ছিল তাঁর মূল কথা। ফলে তাঁর দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হ'ল না।

অনেকটা হতাশার মধ্যে সময় কাটতে লাগল। কোনরকমে মসজিদের ছোট্ট জায়গাটিতে একটা বেড়ার কাঠামো দাঁড় করিয়ে ওয়াক্তিয়া জামা'আত শুরু করেছিলাম। প্রথম দিনগুলোর কথা আর কি বলব! নিজেই আযান দিতাম, তারপর অপেক্ষা করতাম কেউ আসে কি-না। কেউ যখন আসত না তখন নিজেই একামত দিয়ে ছালাত শুরু করতাম।

তারপর ছালাত শেষ হওয়ার পরও দেখতাম আর কেউ আসেনি, আমি একাই মুছল্লী। এভাবেই গেছে প্রথম বেশ কিছুদিন। মাসখানিক যাওয়ার পর আস্তে আস্তে দু'একজন আসা শুরু হ'ল। তাদের সাথে আমি কে, কোথা থেকে এসেছি এমন প্রশ্নের উত্তর দিতেই অনেক সময় চলে যেত। তারপর বাজারে কেনাকাটা করার সূত্রে কিছু মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা হ'ল। তাদেরকে মসজিদে আসতে বলি। এভাবে মুছল্লীর সংখ্যাটা বেড়ে একসময় ৫/৬-এ উন্নীত হয়। আশ-পাশের দু'একটা বাচ্চাও ছালাতের জন্য আসত। তাদেরকে কুরআন শিখানোর জন্য মসজিদে মক্তব চালু করলাম। আমার পড়ানোর পদ্ধতির কারণে তারা বেশ আগ্রহের সাথে আসতে লাগল। একসময় তারা আমার প্রতি এত আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে, পিতামাতা তাদেরকে নিষেধ করলেও তারা ফাঁকি দিয়ে আমার এখানে আসত। এদের মধ্যেই আমি প্রথম আহলেহাদীছের দাওয়াত প্রচার শুরু করি। আল্লাহ সম্পর্কে, নবী সম্পর্কে তাদেরকে সঠিক আক্বীদা শিক্ষা দেই, ছালাতের সঠিক নিয়ম-কানূন শিখাই। তারা বাড়ী গিয়ে তাদের পিতা-মাতাকে সেসব বলত। এভাবে আস্তে আস্তে এলাকাবাসীর সাথে সুসম্পর্ক তৈরী হ'তে থাকল। আমার আচার-ব্যবহারেও তারা ছিল বেশ মুগ্ধ। কখনও কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতাম না। শুধুমাত্র মুসলমানদের সঠিক আক্বীদা ও আমল কি হওয়া উচিত এটুকুই বলতাম। সে কারণে এলাকার দেওবন্দী আলেমগণ নিজ নিজ মসজিদে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়া শুরু করলেও আমার সামনাসামনি এসে বিরোধিতা করার সুযোগ পেতেন না। এমতবস্থায় একদিন সাহস করে জুম'আর জামা'আত চালু করলাম। মসজিদ একেবারে বাজারের মধ্যে হওয়ায় কিছু মুছল্লী ছালাতের সময় আসল। সব মিলিয়ে মুছল্লী হ'ল ২০ জনের মত। এভাবেই ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে বালাকোটে প্রথম আহলেহাদীছ জুম'আর জামা'আত চালু করতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

আত-তাহরীক : মসজিদ নির্মাণে স্থানীয়রা কি বাধা দিয়েছিল? স্থানীয় আলেম-ওলামার ভূমিকা কি ছিল?

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : আসলে জায়গা আমাদের নিজস্ব কেনা ছিল বলে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে সরাসরি বাধা তেমন আসেনি। তবে পার্শ্ববর্তী হানাফী মসজিদের ইমামরা খুৎবাতে লা-মাযহাবীদের বিরুদ্ধে স্বভাবসুলভ গালিগালাজ করতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনও তাদের আক্রমণের জবাব দেইনি। কারু বিরুদ্ধাচরণ না করে নিজের মতো যতটুকু সম্ভব মানুষকে হক্বের দাওয়াত দিয়ে যাব, এটাই ছিল আমার পরিকল্পনা। ফলে স্থানীয় আলেম-ওলামা বা সাধারণ মানুষের সাথে উচ্চ পর্যায়ের বিতর্ক বা বাহাছ-মুনাযারা এমন কিছু কোনদিন ঘটেনি। বরং মানুষজন আমাকে নম্র-ভদ্র ও সজ্জন হিসাবে বেশ শ্রদ্ধাই করত। বাচ্চাদের ক্রমাগত আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পেতে থাকলে আমি মসজিদের সাথে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলার পরিকল্পনা করি। তখনকার বিবেচনায় এমন পরিকল্পনা একেবারেই নতুন ছিল। এলাকার মানুষ তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখত না। এর মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য ছিল এলাকার মানুষের মাঝে আমার মসজিদের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো। ১৯৮১ সালে মসজিদের পার্শ্বেই ছোট্ট স্কুলটি চালু করতে সক্ষম হই এবং বেশ কিছু ছাত্র ভর্তি হয়। এভাবে স্থানীয়দের সাথে আমার একটা ভাল সামাজিক যোগাযোগ তৈরী হয়। মসজিদের মুছল্লী ততদিনে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারও আহলেহাদীছের দাওয়াত কবুল করে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল করা শুরু করেছে। ফলে জুম'আর দিন ছোট্ট মসজিদটায় আর সংকুলান হচ্ছিল না। সে কারণে রাস্তার সংলগ্ন বর্তমান স্থানটি কেনার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করি। কিন্তু জমির মালিক কিছুতেই দিতে রাযী হ'ল না। এক পর্যায়ে জমির মালিক মৃত্যুবরণ করল। আমি তাঁর ছেলেদের কাছে গেলাম, তারাও রাযী হ'ল না। সে এক লম্বা কাহিনী। অবশেষে দীর্ঘ কয়েকবছর লাগাতার চেষ্টার পর ৮৩ বা ৮৪ সালের দিকে জমিটি কিনতে সক্ষম হই। সবমিলিয়ে এখানে প্রায় ৩ কানাল বা ৬০ মারলা (১ কানাল= ১ একরের ৮ ভাগের ১ ভাগ) জায়গা কেনা হয়। তারপর কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কাছে আবেদন পাঠাই এখানে একটি বড় মসজিদের মঞ্জুরী দানের জন্য। শহরটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি নযর রেখে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত থেকে দায়িত্বশীলবৃন্দ এখানে পরিদর্শনে আসেন এবং ইসলামাবাদের ফয়ছাল মসজিদের আদলে একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর ১৯৮৫ সালে মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং বছরখানিকের মধ্যে শেষ হয়। চারপার্শ্বে চার মিনারওয়ালা তৃতলবিশিষ্ট মসজিদটি এতই দৃষ্টিনন্দন ছিল যে বালাকোটে আসা পর্যটকরা একে বিশেষ মসজিদ গণ্য করতে থাকে। অনেক দূর থেকে মসজিদটি দেখা যেত। বাজারের কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় এই মসজিদটি স্থানীয়ভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ছালাতে আহলেহাদীছ ছাড়াও বহু হানাফী আসত। জুম'আর দিন মসজিদের ভিতর-বাহির মিলে প্রায় দুই-আড়াই হাযারের মত মুছল্লী হ'ত। এভাবে মসজিদের প্রসিদ্ধির সাথে সাথে আহলেহাদীছের দাওয়াতও প্রসার লাভ করতে থাকে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

***আত-তাহরীক :* ২০০৫ সালে মসজিদটি যখন ধ্বংস হয়ে যায় সে সময়ের ঘটনাটি বলুন।**

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : ২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবরের সেই দিনটির ভয়াবহ স্মৃতি মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। সেদিন তো ভূমিকম্প হয়নি, যেন কিয়ামত হয়ে গিয়েছিল সমগ্র উপত্যকায়। সকাল সাড়ে ৮-টা বাজে। আমি তখন এই ঘরেই ছিলাম (আমরা যে ঘরের সামনে বারান্দায় বসেছিলাম সে স্থানটি নির্দেশ করে)। হঠাৎ তীব্র এক ঝাঁকুনী দিয়ে উপর থেকে ছাদ খসে পড়ল। আমি কিভাবে বেঁচে গেলাম বলতে পারি না। মাথায় এবং বুকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। যদিও কোন ফ্র্যাকচার হয়নি আল-হামদুলিল্লাহ। আমার ড্রাইভার, অফিস স্টাফ, মসজিদের ইমাম ও খাদেম প্রত্যেকেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল আল্লাহ্র খাছ রহমতে। বাইরে বের হয়ে দেখি উপত্যকার প্রতিটি প্রান্তে যেন প্রলয়

ঘটে গেছে। যেদিকেই তাকাই কেবল ধ্বংসস্তূপ আর মানুষের চিৎকার-আর্তনাদ। আর আমার অন্তরাত্মায় জড়িয়ে থাকা তিনতলা বিশাল মসজিদটিও মাটির সাথে গুড়িয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কোন হুঁশ ছিল না। পাগলের মত একটানা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া মানুষ উদ্ধারে সহায়তা করলাম। তারপর যখন যোহরের সময় হ'ল মসজিদে ফিরে আসলাম। কোন মুছল্লী নেই। একাই আযান দিয়ে একাই ছালাত আদায় করলাম। তখন কেবলই স্মরণ হচ্ছিল সেদিনটির কথা যেদিন একাকী এই মসজিদে প্রথম ছালাত শুরু করেছিলাম। ৩০ বছর পর মসজিদটি হঠাৎ চোখের পলকে সেই প্রথমদিনে ফিরে গেল। বেদনায় এমন মুষড়ে পড়েছিলাম যে, আল্লাহ্র কাছে কিছু চাওয়ার অনুভূতিও ছিল না।

পরের টানা দু'দিন পর্যন্ত বাইরে কোথাও যোগাযোগের কোন সুযোগ ছিল না। রাস্তা-ঘাট সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দু'দিন পর রাস্তা ঠিক হ'লে শত শত এ্যাম্বুলেন্স এবং উদ্ধারকারী ক্রেন শহরে প্রবেশ করে এবং মানুষ বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায়। আমি সোজা মুযাফ্ফরাবাদে আমার বাড়ীতে যাই। তখনও জানতাম না বাড়িতে কেউ বেঁচে আছে কি-না। যাওয়ার পর দেখতে পাই আমার বাড়ীঘর ধ্বংস হয়ে গেলেও আল্লাহ্র অশেষ রহমত আমার পরিবারের সবাই রক্ষা পেয়েছে। কয়েকদিন পর আমি মুযাফ্ফরাবাদ থেকে ট্যাক্সিলার ওয়াহ কান্টনমেন্ট এরিয়ায় আমার বর্তমান আবাসস্থলে স্বপরিবারে হিজরত করে আসি।

ভূমিকম্পের সপ্তাহ দুই পর সরকারী অনুদানে টিনশেড দিয়ে মসজিদটি অস্থায়ীভাবে দাঁড় করাই। সেই থেকে মসজিদটি টিনশেডই রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কাছে একাধিকবার মসজিদটি পুনর্নির্মাণের আবেদন করে সাড়া পাইনি। অবশ্য আমি এতে বিচলিতও নই। কারণ আল্লাহ্র ঘর আল্লাহই নির্মাণ করিয়েছিলেন আমার হাত দিয়ে, আবার তিনিই ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ চাইলে আবারও মসজিদটি কোন একদিন পুনর্নির্মিত হয়ে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমি না থাকলেও অন্য কারো হাতে নিশ্চয়ই হবে-এটাই কামনা করি সর্বদা।

***আত-তাহরীক :* আপনি স্থানীয়দের মধ্যে আহলেহাদীছের দাওয়াত প্রসারে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে আসছেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। এই উপত্যকায় এর প্রভাবটা কতটুকু পড়েছে বলে মনে করেন?**

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : কতটুকু প্রভাব পড়েছে সেটা ভিন্ন কথা। তবে একজন দাঈ হিসাবে সত্যি বলতে কি আমি সন্তুষ্ট নই। আমি জানি অনেক পরিবার আমাদের দাওয়াতের ফলে বিশুদ্ধ আক্বীদা গ্রহণ করেছে ও কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক আমল শুরু করেছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি সাংগঠনিকভাবে আমরা শক্তিশালী হ'তাম এবং দাওয়াতী কাজটা যথাযথভাবে করতে পারতাম, তবে এ এলাকার একটা মানুষও ভ্রান্ত আক্বীদার উপর থাকত না ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সাংগঠনিক সমস্যার কারণে আমরা বেশ পিছিয়ে যাচ্ছি। আমি খুব কষ্ট পাই যখন দেখি আমাদের মধ্যে তুচ্ছ কারণে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশে গঠিত 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর কমিটিতে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। এ কারণে আমি নিজেও কয়েকবছর ধরে সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় নই। যদিও আমাকে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য এবং আযাদ কাশ্মীর ও রাওয়ালপিণ্ডির কমিটিতে নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু কেপিকে'র কমিটি নিয়ে সমস্যাটি দূর না হওয়া পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরেকটা সমস্যা হ'ল, নবাগত আহলেহাদীছরা তাক্বলীদের বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। তাক্বলীদ বর্জনের মূলনীতি অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ায় তারা এতদূর পর্যন্ত চলে যায় যে হক্বপন্থী আলেম-ওলামাদের কাছে সঠিক বিষয়টি জানারও প্রয়োজন বোধ করে না। নিজেরাই পণ্ডিত বনে যায় এবং মূর্খতাবশত কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে। ফলে তাদের মাধ্যমে বেশকিছু সমস্যা তৈরী হচ্ছে। তদুপরি সব মিলিয়ে বলব, প্রথম যেদিন এই অঞ্চলে এসেছিলাম, তখন আহলেহাদীছ কি জিনিস তা এ এলাকার মানুষ জানত না। কিন্তু বর্তমানে কেবল শহরের ভিতরেই প্রায় ৫০টি পরিবারের অনধিক ৩০০/৩৫০ সদস্য আহলেহাদীছ রয়েছে। রয়েছে ৩টি জামে মসজিদ, ফালিল্লা-হিল হামদ। তাই আহলেহাদীছরা কারা–সেটা নিয়ে মানুষের মাঝে এখন কোন সংশয় নেই। বর্তমানে এ অঞ্চলটি আহলেহাদীছের দাওয়াত প্রসারের জন্য খুবই উর্বর। এখানকার মানুষ ব্যক্তিগতভাবে খুবই সৎ, ধর্মপরায়ণ এবং শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর। দাওয়াতী কাজে আরেকটু সময় দিতে পারলে আমার বিশ্বাস খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

***আত-তাহরীক :* বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনের অবিস্মরণীয় ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী এই বালাকোট। স্থানীয় জনগণের মধ্যে সে ব্যাপারে কোন অনুভূতি কি কাজ করে? সেই আন্দোলনের কোন প্রভাব কি তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়?**

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : হ্যা, বালাকোট জিহাদ নিয়ে এই এলাকার মানুষের আবেগ খুবই সক্রিয়। এখানকার আবালবৃদ্ধবণিতা সাইয়েদ আহমাদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের প্রতি প্রবল ভক্তি পোষণ করে। বিশেষ করে তাঁদের শাহাদতের স্থান হিসাবে তারা এই বালাকোট উপত্যকাকে একটি পবিত্র ভূখণ্ড বলে গণ্য করে। তবে সত্যিকার অর্থে এই আবেগ ও ভক্তির স্থানটা কেবল অন্তরেই, বাহ্যিক আমল-আক্বীদায় তার কোন প্রতিফলন নেই। বিশেষতঃ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদরা যে তাওহীদপন্থী এবং শিরক-বিদ'আত প্রতিরোধী আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে এলাকার সাধারণ মানুষ তো বটেই, আলেম-ওলামারাও বেখবর। আর সেজন্য ভূমিকম্পের আগ পর্যন্ত তাঁদের কবরগুলো পাকা করে তার উপর চাদর টানিয়ে একপ্রকার মাযারপূজাই চলে আসছিল। আমি নিজে বেশ কয়েকবার সে চাদর উঠিয়ে নিয়ে এসেছি এবং তাদের অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কাজ হয়নি। তবে ভূমিকম্পের পর থেকে সে সব আয়োজন আর হয় না।

***আত-তাহরীক :* আরেকটি বিষয় স্রেফ কৌতূহলবশতঃ জানতে**

চাচ্ছি, আমরা ইতিহাসে দেখি সাইয়েদ আহমাদ শহীদ সাতবানে ঝরণার কাছে নিহত হবার পর তাঁর লাশের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি অথবা কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁর মস্ত কবিহীন লাশের সন্ধান পেয়ে গ্রামবাসী কুনাহার নদীর পাশে দাফন করেছিল। আবার কোন বর্ণনায় তাঁর খণ্ডিত মস্তকটি নদীতে পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটিই কবরস্থ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। তাহ'লে বর্তমানে কুনাহার ব্রীজের পার্শ্বে তাঁর যে কবরটি রয়েছে এ সম্পর্কে এলাকাবাসী বা আপনাদের ধারণা কি? তাঁর দাফন কি সত্যিই এখানে হয়েছিল?

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, যুদ্ধের পর তাঁর দেহটি পাওয়া যায়নি, তবে তাঁর খণ্ডিত মস্তকটি পাওয়া গিয়েছিল নদীতে এবং বর্তমান স্থানেই সেটি দাফন করা হয়েছিল। এ ধারণাটি আরো ভিত্তি পায়, যখন তাঁর সাথী মুজাহিদ ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী নিজের মৃত্যুর পর লাশটি এখানে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের পার্শ্বে দাফন করার জন্য অছিয়ত করেছিলেন এবং তাঁকে এখানেই কবর দেয়া হয়েছিল।

তবে একবার আমার পরিচিত করাচীর এক প্রবীণ দেওবন্দী আলেম এখানে এসে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদের কবরের পার্শ্বে মুরাকাবায় বসেছিলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, 'আমি যখন শাহ ইসমাঈল শহীদের কবরের পার্শ্বে মুরাকাবায় বসেছিলাম, তখন কবর থেকে একটি আকাশমুখী নূর দেখেছিলাম। কিন্তু সাইয়েদ আহমাদ শহীদের কবরে অনুরূপ কিছু দেখিনি। আমার মনে হচ্ছে তাঁর দেহটি এই কবরে নেই'। যাহোক তাঁর বক্তব্য কোন উল্লেখযোগ্য সূত্রের মধ্যে পড়ে না। কেবল এটুকুই বলা যায়, তাঁর দেহ বা দেহাংশটি এখানেই দাফন করা হয়েছিল কি না সে বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। তবে শুরু থেকে এটিই তাঁর কবর হিসাবে প্রচলিত রয়েছে। মূল বিষয়টি আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আত-তাহরীক : **পরিশেষে জানতে চাইব, অত্র অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতের প্রসারে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?**

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তো অনেক কিছুই। আপাততঃ এটুকু বলতে পারি এখানে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করাটা আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। আর দ্বিতীয়তঃ এ এলাকায় আমাদের কোন প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। যা নতুন প্রজন্মের জন্য খুবই যরূরী হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও আমরা শুরু করতে পারিনি। আর ভূমিকম্পের পর তো এখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই থমকে গেছে। এখনও তার রেশ কেটে উঠেনি। এ অবস্থার মধ্যেও আশা আছে খুব শীঘ্রই আমরা এই উদ্যোগটি গ্রহণ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আত-তাহরীক : **আমাদেরকে দীর্ঘ সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।**

মাওলানা মুযাফ্ফরাবাদী : আপনাকেও ধন্যবাদ। যখন রাওয়ালপিণ্ডিতে পড়তাম তখন দু'একজন বাঙ্গালী সহপাঠী ছিল। তাদের নাম-ধাম এখন ভুলে গেছি। অনেকদিন পর আরেক বাঙ্গালী আহলেহাদীছ ভাইকে পেয়ে আমি খুব খুশী হ'লাম। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন এবং দ্বীনের পথে আমৃত্যু অটল রাখুন- আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রচারিত অডিও-ভিডিও-জুম'আর খুৎবা, বই-পত্র ও প্রবন্ধ সমূহ পাওয়ার জন্য ব্রাউজ করুন-

www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html
www.ahlehadeethbd.org/books.html
www.ahlehadeethbd.org/article.html

শিক্ষক-শিক্ষিকা আবশ্যক

'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' দেশের অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার সাথে সাথে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন জান্নাত পিয়াসী একদল আদর্শ মানুষ তৈরী করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই এ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমমনা আত্মপ্রত্যয়ী শিক্ষক ও শিক্ষিকা আবশ্যক। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলাকে নিজেদের জন্য জান্নাতের পাথেয় হিসাবে মনে করবেন এবং এজন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন। **'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'** ও তার মহিলা শাখা **'মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা'** নওদাপাড়া, রাজশাহীর জন্য আলিম ও দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম ২জন পুরুষ ও ২জন মহিলা শিক্ষক-শিক্ষিকা আবশ্যক। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষ। আগ্রহী প্রার্থীগণের নিম্নোক্ত ঠিকানায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপিসহ আবেদনের শেষ তারিখ ১০ জুলাই ২০১৪।

সভাপতি/সম্পাদক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী পরিচালনা কমিটি
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০১৭১১৩৫৯৪৭৫, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

কবিতা

আখেরাতের যাত্রী

সোহেল আহমাদ
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

নেমে এলো ঘন তম সেই মহা রাত্রি
হুঁশিয়ার হও ওগো ওপারের যাত্রী।
হাতে ছিল লণ্ঠন তৈল শেষ তাহাতে
বহু পথ পাড়ি দেবে তুমি কোন আলোতে।
সংসারে সুখে ছিলে কত মধু মমতা
আজ তুমি একা হলে নেই কোন ক্ষমতা।
ধরণীতে রেখে গেলে সঞ্চিত অর্থ
অসহায় আজ তুমি সব হলো ব্যর্থ।
সেই মলিন আজি দেখে মহাচন্ড
চোখ ফেটে আসে পানি ভিজে দুই গণ্ড।
যুগে যুগে ডেকে ছিল সত্যের যাত্রী
নচেৎ আধাঁর হতো হিসাবের রাত্রি।
আজ তুমি কি নেবে আরো তুমি কি চাও
কেনা-বেচা শেষ আজি খালি হাতে চলে যাও!
নেমে এলো ঘন তম সেই মহারাত্রি
হুঁশিয়ার হও ওগো আখেরাতের যাত্রী।

দাওরে যাকাত

মুহাম্মাদ ওবাইদুর রহমান
মহোনপুর, রাজশাহী।

দুনিয়া ছেড়ে সবাই যাবে
থাকবে জমা-জমি,
ধনীর মালে গরীবের ভাগ
আছে সবাই জানি।
মাসের সেরা রামাযান মাসে
গরীবের খবর নাও,
ফরয ভেবে মালের যাকাত
নিঃস্বের মাঝে বিলাও।
ছিয়াম রাখ, যাকাত দাও
কায়েম কর ছালাত,
মৃত্যুর পর পেয়ে যাবে
শান্তির জায়গা জান্নাত।

দুঃখের কথা

মুহাম্মাদ মোবারক হোসেন
রাজশাহী ডিজিটাল প্লাস মডেল স্কুল, রাজশাহী।

বলব কি আর দুঃখের কথা বলতে পরাণ ফাটে
দুঃখ কেন যায় না বেচা ভবের এ বাজার-হাটে?
চোরের মায়ের ডাঙ্গর গলা বাদী ভয়ে পালায়
প্রাণটা বুঝি যায়রে এবার চোরের মায়ের জ্বালায়।
দুর্নীতি করে সন্ত্রাসীরা সাধু প্রাণে মরে
সারা দেশটা ভুগছে আজ দুর্নীতির ভাইরাস জ্বরে।
মাঘের শীতে ঘি জমে, না জমে সরিষার তেল
অসহায় লোকের মাথায় এখন ভাঙ্গে সবাই বেল।
মানী লোকের নাইরে মান ক্ষমতার করে পূজা
আল্লাহকে চেনে না তবু ঈমানদার, রামাযানে নাই রোযা।
সারা বছর নাইরে ছালাত ঈদে প্রথম সারি
ইমাম ছাহেবকে করেন হুকুম পড়ুন তাড়াতাড়ি।
দুঃখিনী মা ভিক্ষা করেন গ্রামের পথে পথে
খোকন-সোনা ব্যস্ত এখন নেতা-নেত্রীর সাথে।
চেনে না সে বাপের কবর নেতার মাযারে ফুল
ফুল কিনতে বিক্রি করে বউয়ের কানের দুল।
দেশের সম্পদ লুটেও তিনি দেশদরদী নেতা
এ নেতার মুখেই শুনা যায় যত ডাহা মিথ্যা কথা।
সত্য কথা যায় না বলা উচিত কথায় ঝাল
উচিত কথা শুনলে নেতার গাল ফুলে হয় লাল।
আমের ছোঁয়া নেইকো তবু নামটি ম্যাংগোজুস
এভাবে আর ঠকবি কত ফিরবে কবে হুঁশ?

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

মাহদী হাবীব।

গণতন্ত্রের অর্থ হল
জনগণের শাসন
যে শাসনের জন্য থাকে
নানা রকম আসন।
জনগণের জন্য সরকার
জনগণের দ্বারা
জনগণের মধ্য থেকে
হবে বাছাই করা।
গণতন্ত্রের এমন তত্ত্ব
বাস্তবতায় গিয়ে
জনগণের ভাগ্য কিনে
নগদ পয়সা দিয়ে।
সূদ-আসলে সেই পয়সা
তুলতে গিয়ে ঘরে
রক্ত চোষে নেতা-নেত্রী
জনগণই মরে।

বিদ্রোহ

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আমি মিথ্যার সাথে ঘোষিয়া বিদ্রোহ এক আল্লাহকে মানি ইলাহ
শত মত পথ দলিয়া মথিয়া চলি রাসূল (ছাঃ)-এর বলা যে রাহ।
হাযার গায়রুল্লাহ্‌র বক্ষেতে শক্তি হানে আমার যে তলোয়ার,
মম হুঙ্কারে কাঁপে তাগূতেরা তার কলিজা কাঁপে যে থরথর।
বিদ'আতীর যারা করে উপাসনা তারা কাঁপে প্রাণ ভয়েতে,
আমার অভিযান থামিবে না কভু চলবে বিশ্ব জয়েতে।
সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে যারা উদিত হ'ল এ ভুবনে,
স্বার্থের প্রদীপে দেখে যারা মুখ মিথ্যার বুলি যবানে।
নিঃস্বের বুকে রেখে পদভার দ্যুলকে গড়িলে স্বর্গ
মানুষের পাঁজর চুষিয়া বানালো গগনচুম্বী দুর্গ।
যাহারা বানালো ধূলার ধরাতে ভয়ের রাজ্য কায়েম করতে ত্রাস,
তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমি তাদের করিব নাশ।
তাদের মুখের প্রলোভিত জিব কেটে করি আমি খান খান,
বলিছে যে মুখে মিথ্যার বুলি টুটি তার শত গর্দান।
এক আল্লাহকে ছাড়া কারো কাছে আমি করি নাক কভু নত শির,
তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমি যারা আল্লাহ্‌র শত্রু ধরণীর।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)
২. আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ)
৩. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)
৪. ইবরাহীম (আঃ)
৫. মূসা (আঃ). খিযিরের নিকটে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা তওবা, ৮৪ নং আয়াত।
২. হুদহুদ *(নামল ২০)*, কাক *(মায়েদাহ ৩১)*।
৩. সূরা হুজুরাত।
৪. সূরা নিসা, আয়াত ২৩-২৪।
৫. হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের কোন সূরার প্রতি ভালবাসা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?
২. কোন সূরাটি পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমপরিমাণ?
৩. পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আয়াত কোন সূরায়?
৪. কুরআনে কে হরকত (যের, যবর ও পেশ ইত্যাদি) সংযোজন করেন?
৫. পবিত্র কুরআনে কতটি অক্ষর রয়েছে?

সংগ্রহে : ইবরাহীম খলীল
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষার (ধাঁধা)

১. লম্বায় কাট, প্রস্থে কাট, কাট তলাতে
ক্রমে ক্রমে বড় হবে, ছোট নাহি হবে।
কাটলে সকল জিনিস ছোট হয়ে যায়
এমন কি আছে যা কাটলে বড় হয়।

২. মানুষ নয় প্রাণীও নয় পিছে পিছে ঘুরে
লাথি দিলে সেও লাথি দেয় গায়ের জোরে।

৩. পানির বস্তু নয় তবু পানিতে রয়
সকলে তার বুকে আসে আর যায়।

৪. সাগরে জন্ম তার আকাশে উড়ে
পর্বতে মার খেয়ে কেঁদে ঝরে পড়ে।

৫. আঁধার ঘরে বাঁদর নাচে
না না করলে আরো জোরে নাচে।

সংগ্রহে : তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সোনামণি সংবাদ

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৮ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাগমারা উপযেলা সোনামণির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সোনামণি পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী হাফেয শহীদুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ ইসমাঈল। অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসাইনকে পরিচালক করে সোনামণি বাগমারা উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

বাগেরহাট ১৮ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা জামে মসজিদে সোনামণি বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মাদরাসা সুপার মাওলানা যুবায়ের ঢালী, অর্থ সম্পাদক মামূনুর রশীদ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুযযামান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে যেলা কমিটি পুনর্গঠন, অত্র মারকায শাখা এবং চিতলমারী মাদরাসা শাখা গঠন করা হয়।

মহব্বতপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মহব্বতপুর আলিম মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মহব্বতপুর শাখা সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি' পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান, শামীম ও শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রাকীব ও জাগরণী পরিবেশন করে সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে মেমোরীতে আহলেহাদীছ বক্তাদের বক্তব্য ও ইসলামী গান লোড দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ
আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের সামনে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

স্বদেশ

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

ট্রেন চলবে কিন্তু লাইন স্পর্শ করবে না

ট্রেন চলবে। কিন্তু ট্রেনের চাকা লাইন স্পর্শ করবে না। চুম্বকের সাহায্যে এটি এগিয়ে চলবে এবং গন্তব্যে পৌঁছবে চোখের পলকে। বিশ্বের পরিবহন সেক্টরে অবিশ্বাস্য হ'লেও এখন তা সত্য এবং বাস্তব। আর এর পুরো কৃতিত্ব একজন বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর। তিনি হ'লেন ড. আতাউল করীম। বিশ্বের সেরা ১০০ জন বিজ্ঞানীর একজন তিনি। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ার নরফোকে অবস্থিত ওল্ড ডোমিনিয়ন ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট (গবেষণা) ড. আতাউল করীমের এ সাফল্যের কাহিনী মার্কিন মিডিয়াতেও ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষকেরা বিগত ৭ বছর ধরে এ ধরনের একটি ট্রেন তৈরীর গবেষণায় ফেডারেল প্রশাসনের বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু তা সাফল্যের মুখ দেখেনি। অবশেষে ২০০৪ সালে তিনি এই গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং গত দেড় বছর পূর্বে ট্রেনটি নির্মাণে সক্ষম হন। সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এখন শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালু করার কাজটি বাকি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ৩০ বছর আগে আমেরিকায় এসেছেন ড. আতাউল করীম। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী নেয়ার পর শুরু করেন পেশাগত জীবন এবং মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে বর্তমানে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে ৬টি কলেজ, কমপক্ষে ২০টি গবেষণাকেন্দ্র, ৬শত শিক্ষক এবং ৫ হাযারের উপরে গ্রাজুয়েট ও আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রী।

জার্মানী, চীন ও জাপানে ১৫০ মাইলের বেশী বেগে চলমান ট্রেন আবিস্কৃত হ'লেও তাতে প্রতি মাইল ট্র্যাক বা লাইনের জন্য গড়ে খরচ ১১০ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু ড. আতাউল করীমের এ ট্রেনে খরচ হবে মাত্র ১২/১৩ মিলিয়ন ডলার।

সাগরের বুকে জেগে উঠছে নতুন বাংলাদেশ

সাগরপ্রান্তে ব্যাপকভাবে চর জেগে ওঠায় বাংলাদেশের আয়তন বাড়ছে। এসব চর সুপরিকল্পিতভাবে সুরক্ষা ও উদ্ধার করা গেলে হাযার হাযার বর্গমাইল ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হবে। এছাড়া সদ্য জেগে ওঠা এলাকাগুলিতে ক্রসবাঁধ দিয়ে ভূমি উদ্ধার এবং বনায়নের মাধ্যমে তা স্থায়ীকরণ করা যাবে। সাগর প্রান্তে নিঝুম দ্বীপের আশপাশের জমি উদ্ধার করে বনায়ন এবং পর্যটন জোন গড়ে তোলা হ'লে পর্যটন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

আইডব্লিউএম-এর উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক যহীরুল হক খান সরেজমিন পরিদর্শন শেষে বলেন, 'নঙ্গলিয়া এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরে গিয়ে মেঘনার মোহনা জুড়ে বড় বড় আয়তনের নতুন ভূখণ্ড দেখা গেছে। সেসব চরের পরিণত জমিতে উড়ি ঘাস গজাতেও শুরু করেছে।' তিনি জানান, উড়িরচর থেকে জাহাজের চর পর্যন্ত ক্রসবাঁধ নির্মাণ করে এ মুহূর্তেই ৫৫ হাযার হেক্টর ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব। হাতিয়া-নিঝুমদ্বীপ-ধামারচর এবং ধুলা-চরমোন্তাজ-চরকুকরি মুকরি এলাকায় ক্রসবাঁধের মাধ্যমে মূল স্থলভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করার খুবই চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে মাত্র দশ বছরের মধ্যেই অন্তত ২০ হাযার বর্গমাইল আয়তনের 'অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড' মিলবে।

বিদেশ

ভারতের ১৬ তম লোকসভা নির্বাচন ২০১৪

বিপুল ব্যবধানে বিজেপির বিজয়, মোদী প্রধানমন্ত্রী

এক নযরে ফলাফল : মোট আসন সংখ্যা- **৫৪৩**। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন **২৭২**। বিজেপি এককভাবে **-২৮৪**, জোটগতভাবে (এনডিএ)-**৩৪০**। কংগ্রেস এককভাবে **৪৪**, জোটগতভাবে (ইউপিএ)-**৬২**। তামিলনাড়ু (জয়ললিতার দল) **৩৬**। পশ্চিমবঙ্গ (মমতার তৃণমূল কংগ্রেস) **-৩৪**। অন্যান্য **-১৪৩**। উল্লেখ যে, বিগত সোয়াশো' বছরের ইতিহাসে কংগ্রেসের এটাই সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয়।

[গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে হাযার হাযার নিরপরাধ মুসলিমের খুনে হাত রাঙ্গানো এই নরেন্দ্র মোদীর বিজয়কে কেউ কেউ হিন্দুত্ববাদের জয় হিসাবে দেখাতে চাইছেন। কিন্তু শুধু হিন্দুত্ববাদ নয়; বরং একদিকে কংগ্রেস সরকারের দুর্বল শাসন, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সুশাসনে ব্যর্থতা, অন্যদিকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন করায় ব্যক্তি হিসাবে মোদীর সততা, সাধারণ জীবন-যাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তা, তীব্র পরিশ্রম করার মানসিকতা এবং মানুষকে মুগ্ধ করার মতো ব্যক্তিত্ব ও সুবক্তা ইত্যাদি গুণাবলীও ভারতের জনমনে তাকে বিশেষ স্থান করে দিয়েছে]।

মায়ের ক্ষমায় বাঁচল ছেলের খুনীর প্রাণ!

চোখ বেঁধে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে ফাঁসির মঞ্চে, গলায় পরানো হয়েছে ফাঁসির দড়ি। কিন্তু মমতাময়ী 'মা' আর সইতে পারলেন না, দ্রুত গিয়ে ছেলেকে চড় মেরে ভেঙে পড়লেন কান্নায়, আর নিহতের পিতা গিয়ে খুলে দিলেন ফাঁসির দড়ি। প্রাণে বেঁচে গেল ২৭ বছরের বেলাল। সামনে অপেক্ষমাণ হতবিহ্বল জনতার মধ্যে যেন ছড়িয়ে গেল মায়ের বুকে জমে থাকা বোবাকান্নার ঢেউ। এক মা এভাবেই বাঁচালেন তাঁর নিজের ছেলের খুনিকে। দেশের আইন অনুযায়ী প্রকাশ্যে ফাঁসি কার্যকরের সময় সম্প্রতি বিরল এই ক্ষমাশীলতার ঘটনা ঘটেছে ইরানে। সাত বছর আগে ২০ বছর বয়সী বেলাল তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে ছুরির আঘাতে কেড়ে নিয়েছিল ১৮ বছর বয়সী আবদুল্লাহ হোসেনজাদেহ্‌র প্রাণ। ইরানের মাজানদারান প্রদেশের ছোট্ট শহর রোয়ানে এ ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বেলাল। বিচার শুরু হয় তার। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ফাঁসির রায় হয় তার। দেশের আইন অনুযায়ী ফাঁসি হবে প্রকাশ্যে এবং ফাঁসি কার্যকরের ঘটনায় অংশ নিতে হবে নিহতের পরিবারকেও।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত বেলালকে চোখ বাঁধা অবস্থায় গলায় ফাঁসির দড়ি পরানোর পর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আবদুল্লাহ্‌র পরিবারের কাউকে গিয়ে তার পায়ের নীচ থেকে কাঠটা সরিয়ে দেওয়ার কথা। ঠিক এ সময় ফাঁসি-কাষ্ঠের দিকে এগিয়ে যান নিহত আবদুল্লাহ্‌র মা। তিনি গিয়ে ছেলের খুনি বেলালকে একটা চড় মেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আর পেছনে দাঁড়ানো আবদুল্লাহ্‌র বাবা ছেলের খুনির গলা থেকে খুলে নেন ফাঁসির দড়ি।

ছেলের খুনিকে ক্ষমা করে নিহত আবদুল্লাহর মা যখন নেমে আসছেন ফাঁসির মঞ্চ থেকে, তখন বেলালের মা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। এক মা কাঁদলেন ছেলে হারানোর বেদনায়, আরেক মা কাঁদলেন ছেলের প্রাণ বেঁচে যাওয়ায়। কিন্তু পরস্পরকে

জড়িয়ে ধরে এই দুই মায়ের কান্না কি বুঝতে পেরেছে সবাই! একজন মা কোন বোধে, প্রাণের কোন তাড়নায় নিজের ছেলের খুনিকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন, সেই প্রশ্নের উত্তর না মিললেও দুই মায়ের কান্না একটা ঢেউয়ের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল ফাঁসি দেখতে আসা শত মানুষের মধ্যে।

নিহতের পিতা আবদুল গণী হোসেইনজাদেহ জানান, তার স্ত্রীর ক্ষমা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত অনেক বেশী অনন্যসাধারণ। কেননা তারা চার বছর আগে আরও একটি সন্তানকে হারিয়েছেন। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ঐ ছেলের বয়স ছিল মাত্র ১১। তাই আব্দুল্লাহ্‌র মা ঐ সময় বলেন, সন্তান হারানোর বেদনা যে কি, তা আমি জানি। তাই আরেক মায়ের বুক আমি খালি করতে চাইনি।

বাবরী মসজিদে সর্বপ্রথম কোদাল মারতে গিয়ে হাত উপরে নিচে বা সামনে নিতে পারছিলাম না

-সর্বপ্রথম হামলাকারী নওমুসলিম মুহাম্মাদ আমের

ভারতের অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার জন্য সর্বপ্রথম হামলাকারী বর্তমানে বাংলাদেশ সফররত নওমুসলিম মাস্টার মুহাম্মাদ আমের (বলবীর সিং) বলেছেন, অমুসলিমদের মাঝে বেশী বেশী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার পর ভারতবর্ষে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে মুসলমানদের লুণ্ঠনকারী ও সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করা হ'ত। এতে ভারতের অমুসলমানরা ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে উঠে। নওমুসলিম মুহাম্মাদ আমের বলেন, ইসলামের দাওয়াত আমরা আগে পাইনি বলে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভাঙার মতো গর্হিত কাজে অংশ নিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আমাদের ভুল বুঝানো হ'ত মসজিদ ভাঙ্গাই পুণ্যের কাজ। আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে আমি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পেরেছি। গত ২রা মে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ওলামা সম্মেলনে নওমুসলিম মুহাম্মাদ আমের (বলবীর সিং) একথা বলেন।

এছাড়া ২৪শে এপ্রিল কিশোরগঞ্জে আয়োজিত আরেকটি মাহফিলে তিনি বলেন, যারা বাবরী মসজিদকে শহীদ করেছে তারা যালিম। এ রকম যালিমদের কাতারে আমিই ছিলাম নেতৃত্বের সর্বাগ্রে। সেদিন ভারতীয় শিব সেনা সংগঠনের আমি সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলাম। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদে সর্বপ্রথম কোদাল মারতে গিয়ে হাত উপরে নিচে এবং সামনে নিতে পারছিলাম না। আমার বন্ধু ওমর উরফে যোগিন্দর (পরবর্তীতে মুসলমান হন) আমাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। আমি কখনও চাইনি যুলুম ও শিরকের অন্ধকারে হাবুডুবু খাই। তাই আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় আমাকে ইসলামের হেদায়াত দ্বারা ধন্য করেছেন। আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ ভেঙে আমি যে কবীরা গোনাহ করেছি, তার কাফফারা হিসাবে ওমর (যোগিন্দর)-কে নিয়ে বিরান মসজিদগুলো পুনরায় আবাদ ও নতুন মসজিদ তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে ভারতে ৪৫টি মসজিদ আবাদ করেছি এবং ইচ্ছা আছে ১০০টি মসজিদ নির্মাণের। আল্লাহ আমাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন। তাই আমিও মানুষের মাঝে ইসলামের মহান আদর্শ প্রচার করে যাচ্ছি। আমাদের দাওয়াতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ১০ হাযার হিন্দুধর্মাবলম্বী ইতিমধ্যে মুসলমান হয়েছেন। *আলহামদুলিল্লাহ।*

মুসলিম জাহান

৩য় দুবাই পিস কনভেনশন ২০১৪ সমাপ্ত

গত ১৭-১৯ এপ্রিল ৩য় দুবাই পিস কনভেনশন ২০১৪ দুবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। দুবাইয়ের শাসক এবং আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন রশীদ আল-মাকতূমের পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি গত ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের সম্মেলনে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা. যাকির নায়েক (ভারত), ইউসুফ এস্টেস (আমেরিকা), শায়খ ইসমাঈল মূসা মেনক (জিম্বাবুয়ে), ড. মুহাম্মাদ ছালাহ (আমেরিকা), ডা. তৌফিক চৌধুরী (বাংলাদেশ), নো'মান আলী খান (আমেরিকা), আছেম আল-হাকীম (সঊদী আরব), ওয়ালীদ বাসীঊনী (আমেরিকা), আব্দুল বারী ইয়াহইয়া (আমেরিকা), সাঈদ রাযেহ (কানাডা), আহমাদ হামেদ (ভারত)। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মসজিদে হারামের প্রধান ইমাম এবং হারামাইনের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস এবং স্বনামধন্য ক্বারী মিশারী বিন রশীদ আফাসী (কুয়েত) ও গত বছর ইসলাম গ্রহণকারী বহুল আলোচিত ইসলাম বিদ্বেষী ডাচ রাজনীতিবিদ আর্নোড ভ্যান ডুর্ন প্রমুখ। মোট ৩৭ জন ব্যক্তি এই সম্মেলনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে অনুষ্ঠানে ভ্যান ডুর্ন-এর বড় ছেলে আলেকজান্ডার আমিয়েনের ইসলাম গ্রহণ সবাইকে বিস্মিত করেছে।

প্রথমদিনের সভাপতি ইউসুফ এস্টেস (আমেরিকা) তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সুখ এবং শান্তি দু'টো ভিন্ন জিনিস। পার্থিব অর্জনের মাধ্যমে আমরা সুখী হওয়ার প্রতিনিয়ত যে প্রচেষ্টা চালাই, তাতে আমরা কখনই প্রকৃত সুখী হ'তে পারি না। কারণ একটা চাহিদা পূরণের সাথে সাথে আরেকটি চাহিদা এসে উপস্থিত হয়। এই চাহিদার কোন শেষ হয় না। সুতরাং সুখী হওয়ার মূল বিষয় হ'ল আত্মিক প্রশান্তি। আর এই আত্মিক প্রশান্তি আসে যা আমরা পেয়েছি তার উপর তুষ্ট থাকার উপরে, যা আমরা আকাংখা করি তা অর্জনের উপর নয়।'

উল্লেখ্য, ৩দিন ব্যাপী সম্মেলনে আরব আমিরাত এবং উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে প্রায় ৭০ হাযার শ্রোতা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি সেশনে মহিলাদের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। আলোচনা ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং ছোটদের জন্য বিনোদনের বিশেষ আয়োজন করা হয়।

ইসলামী দণ্ডবিধি জারির ঘোষণা দিল ব্রুনাই

পহেলা মে'১৪ থেকে ব্রুনাই দারুসসালামে ১ম পর্বের শরী'আহ আইন তথা ইসলামী দণ্ডবিধি জারির ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির সুলতান হাসান আল-বালক্বিয়াহ (৬৭)। এক রাজকীয় ঘোষণায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম সুলতান বালক্বিয়াহ বলেন, মহান আল্লাহ্‌র উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ঘোষণা করছি যে, ১লা মে থেকে ইসলামী দণ্ডবিধির ১ম পর্ব কার্যকর করা হবে। পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন শুরু হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন জনের থিওরিতে আল্লাহ্‌র আইনকে অস্বচ্ছ ও কর্কশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, তাঁর দেয়া আইন স্বচ্ছ ও সুন্দর। অতএব এ ঘোষণা দিতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকটে শুকরিয়া আদায় করছি। উল্লেখ্য যে, এক বছর আগেই তিনি এ বিষয়ে জনসমক্ষে অবহিত করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১লা মে থেকে বিবাহ-বহির্ভূত গর্ভধারণ, জুম'আর ছালাত না পড়া, অন্য কোন ধর্ম প্রচার ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ

হিসাবে বিবেচিত হবে। ১২ মাস পর ২য় পর্যায়ে চুরির শাস্তি হাতকাটা, মদ্যপানের শাস্তি ১০০ চাবুক মারা, ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি বাস্তবায়ন শুরু হবে। উল্লেখ্য, আগে থেকেই প্রতিবেশী মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে ব্রুনাইয়ে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়োগ অনেক বেশী।

ব্রুনাইর সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয় মুসলিমরা দণ্ডবিধির পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। আর অমুসলিমরা এর সমালোচনা করলেও সুলতানের শান্ত থাকার আহ্বানের পর সবাই থেমে গেছেন।

এদিকে ইসলামী দণ্ডবিধির সূচনার সমালোচনা করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক অফিস। তারা আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী এরূপ আইন জারি করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং শরী'আহ আইনকে অমানবিক ও নির্যাতনমূলক বলে উল্লেখ করেছে।

ব্রুনাই দারুসসালামের বেশীরভাগ মানুষই মালয় মুসলিম। দেশটির ৪ লাখ মানুষের মধ্যে ৬৪ শতাংশ মুসলিম, ১৩ শতাংশ বৌদ্ধ, ১০ শতাংশ খ্রিস্টান। বাকিরা কনফুসিয়ান, তাওবাদ ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। ২০১৩ সালের জুলাইয়ের হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ৩৯ হাযার ৩৫৫ মার্কিন ডলার। জনগণ বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা পায়। ব্যক্তিগত আয়করও পরিশোধ করতে হয় না। দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকে সিঙ্গাপুরের পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রুনাই। এখানে প্রতিটি পরিবারের গড়ে তিনটি করে গাড়ি আছে।

রাজতান্ত্রিক ব্রুনাইয়ের সুলতান একাধারে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান। বর্তমান সুলতান হাসান আল-বালক্বিয়াহ। ৬০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে এ রাজবংশ ব্রুনাই শাসন করছে। এখানে ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি আইন সভা আছে। তবে এর সদস্যরা কেবল আইন প্রণয়নে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন।

[ধন্যবাদ দেশগুলিকে। অথচ ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা আজও পড়ে আছি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে। গুম-খুন-অপহরণ কবলিত বাংলাদেশী নেতাদের এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)]

সঊদী আরবে ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শনী

মধ্যপ্রাচ্যে প্রকাশ্যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শনকারী প্রথম দেশ হওয়ার রেকর্ড গড়ল সঊদী আরব। ২৭ বছর আগে চীন থেকে কেনা ডিএফ-৩ মডেলের এইসব ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমবারের মত গত ২৯শে এপ্রিল ইরাক ও কুয়েত সংলগ্ন সঊদী আরবের পূর্বাঞ্চলীয় শহর 'হাফা'র 'আল-বাতীন' এলাকায় এক সামরিক কুচকাওয়াজে প্রদর্শন করা হয়। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২,৬৫০ কিলোমিটার। প্রতিটি ক্ষেপণাস্ত্র ২,১৫০ কেজি বিস্ফোরক বহনে সক্ষম এবং তা এক থেকে তিন মেগাটন মাত্রার একটি পরমাণু বোমায় সজ্জিত। সামরিক কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সঊদী সেনা কর্মকর্তারা এবং সঊদী যুবরাজ ও উপপ্রধানমন্ত্রী সালমান বিন আবদুল আযীয। পাকিস্তানের সেনা প্রধান রাহিল শরীফ ছাড়াও বাহরাইনের রাজা হামাদ এবং আবুধাবীর যুবরাজ শেখ মুহাম্মাদ বিন যায়েদও এই অনুষ্ঠানে সঊদী সেনাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংবাদ মাধ্যম এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে, এ ঘটনার মাধ্যমে সঊদী সরকার ইরানের সঙ্গে অস্থায়ী পরমাণু সমঝোতা ও আলোচনায় মশগুল ওয়াশিংটনের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছে। এ ঘটনা এটাও তুলে ধরেছে যে, পরমাণু ক্ষেত্রে সঊদী সরকার এখন কেবল আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং পাকিস্তান ও চীনের সহায়তা নিয়ে সে তার নিজস্ব পারমাণবিক বাহিনী গড়ে তুলেছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পৃথিবীর প্রায় সমতুল্য গ্রহের সন্ধান

এবার মহাশূন্যে পৃথিবীর প্রায় সমকক্ষ গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিল রয়েছে এমন যত গ্রহ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা, তার মধ্যে নতুন এই গ্রহটির সঙ্গে সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী বলে জানিয়েছে নাসা। পৃথিবী থেকে আয়তনে কিছুটা বড় এই গ্রহের নাম কেপলার ১৮৬এফ। এর তাপমাত্রাও পৃথিবীর তুলনায় কিছুটা কম। তবু ১৮৬এফ-এর গঠন ও অবস্থান বিচার করে সেখানে পানি থাকার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছে নাসা। যদিও পৃথিবী থেকে ৫০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্রহে আদৌ প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না, তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ভূপৃষ্ঠে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন

তীব্র গরমে এক পশলা বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকেন অনেকেই। বৃষ্টির জন্য যেমন ফসলহানি হয়, তেমনি রোগ-ব্যাধিও বৃদ্ধি পায়। তাতে যেমন দুর্ভোগ বাড়ে তেমনি দেখা দেয় মৃত্যুঝুঁকিও। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব অপটিকস অ্যাণ্ড ফোটোনিকস ও অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানিয়েছেন যে, তারা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানো সম্ভব হবে। মেঘের মধ্যে থাকা কণাগুলোকে লেজারের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করে বজ্রপাত ও ঝড়বৃষ্টি তৈরী করতে পারবেন বলেই গবেষকেরা দাবী করেছেন।

দেশে তৈরী হ'ল সৌরশক্তি চালিত রিকশা

চালকদের সুবিধা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করে সরকারী অনুদানে উদ্ভাবন করা হয়েছে মাইক্রোকন্ট্রোলার সিস্টেম সৌরশক্তিচালিত রিকশা। হুডের উপরে থাকা সৌর প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করে চলবে এ রিকশা। রিকশাচালকদের সুবিধা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. এম শামীম কায়ছার ও মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) প্রভাষক আবু রায়হান ছিদ্দীক সরকারী অনুদানে উদ্ভাবন করেছেন মাইক্রোকন্ট্রোলার সিস্টেম সৌরশক্তিচালিত এ রিকশা।

মাইক্রোকন্ট্রোলার দিয়ে রিকশার একটা নির্দিষ্ট গতিও নির্ধারণ করে দেয়া হবে, যাতে চালক ইচ্ছা করলেও বেশী গতি তুলতে না পারে। এটি টানা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা চালানো যাবে। এছাড়া এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ চাকা ও আধুনিক ব্রেক, যা দুর্ঘটনা এড়াতে সহায়তা করবে। তাছাড়া শীত ও বর্ষাকালের আবহাওয়ার বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে যরূরী অবস্থায় বিদ্যুতের মাধ্যমে ব্যাটারী চার্জ দেয়ার সুবিধা রাখা হয়েছে। ফলে যরূরী প্রয়োজনে সৌরশক্তির পাশাপাশি প্রচলিত পদ্ধতিতেও ব্যাটারী চার্জ করা যাবে। কিন্তু বিদ্যুতে নিয়মিত চার্জ দিলে খুব দ্রুত ব্যাটারী নষ্ট হয়। ফলে চালকরা নিজের স্বার্থেই যরূরী প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যুতের আশ্রয় নেবেন না বলে জানিয়েছেন আবু রায়হান ছিদ্দীক।

উল্লেখ্য, এ বছরের মাঝামাঝিতেই এ রিকশার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ড. শামীম বলেন, সৌরশক্তিচালিত এ রিকশা উৎপাদন খরচ ৬০-৭০ হাযার টাকা হ'তে পারে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : ময়মনসিংহ

হক ও বাতিলের সংগ্রামে সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন!

-আমীরে জামা'আত

গফরগাঁও ৭ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে যেলার গফরগাঁও থানাধীন সৌদিয়া বাজারে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় টুকনরেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক জনাব মাওলানা আব্দুর রাযযাক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সুদূর অতীতে ঈসা খাঁ ও মানসিং-য়ের দ্বৈরখ যুদ্ধের স্মৃতিবাহী এই স্থানে আসতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। সেদিন যেমন তরবারির যুদ্ধে ঈসা খাঁ জিতেছিলেন, আজ তেমনি আদর্শিক যুদ্ধে আমাদেরকে জিততে হবে। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, গফরগাঁও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাজী রমিযুদ্দীন প্রমুখ। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ক্বারী হারূনুর রশীদ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম ও জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও গাযীপুর তিন যেলার মোহনায় অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রোতা যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের পোষ্টার লাগাতে গিয়ে বিদ'আতীদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয় যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ক্বারী হারূনুর রশীদের ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আব্দুর রহমান ওসামা।

এদিন বাদ আছর হ'তে আমীরে জামা'আত পৃথক বৈঠকে যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময়ে তিনি যেলার সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং দায়িত্বশীলদেরকে যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য তাকীদ প্রদান করেন।

যেলা সম্মেলন : বগুড়া

ইসলামী বিচার ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে ঐক্যবদ্ধ হৌন!

-আমীরে জামা'আত

৯ই এপ্রিল বুধবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানের বিচার ব্যবস্থা এবং দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সমাজে কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিষ্টার তাকিউর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ।

যেলা সম্মেলন : মেহেরপুর

চেতনার পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

-আমীরে জামা'আত

বামুন্দি ১২ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলার গাংণী থানাধীন বামুন্দী দাখিল মাদরাসা ময়দানে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মনছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, কথায় কথায় বাঙালী বাঙালী বলে আর চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখী মেলা, বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ প্রভৃতি হিন্দুয়ানী উৎসবকে বাঙ্গালীর আবহমানকালের সার্বজনীন উৎসব বলে অপপ্রচার করে মুসলমানদের ঈমানী চেতনাকে ভোঁতা করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। অথচ কেবলমাত্র ইসলামী চেতনাই এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, গাংণী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন, সহ-সভাপতি ডা. আবুল কালাম আযাদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রশীদ আখতার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, বাদ মাগরিব হ'তে রাত ১০-টা পর্যন্ত আমীরে জামা'আত মেহেরপুর এবং পার্শ্ববর্তী যেলা কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম এবং চূয়াডাঙ্গা যেলার দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট যেলা সমূহের দাওয়াতী কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন। তিনি সকলকে স্ব স্ব দায়িত্বের প্রতি সজাগ থেকে স্রেফ আখেরাতে মুক্তির আশায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই অভ্রান্ত দাওয়াত সমাজের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা সম্মেলন : দিনাজপুর-পূর্ব

সীমান্তে নিয়মিত বাংলাদেশী হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান!

-আমীরে জামা'আত

বিরামপুর ১৮ই এপ্রিল বুধবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বিরামপুর থানাধীন ভারতের সীমান্তবর্তী কাটলা ডিগ্রী কলেজ ময়দানে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আধিপত্যবাদী শক্তির হিংস্র থাবা হ'তে দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতা রক্ষা ও মানুষের জান-মাল ও ইযযত রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলনা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, নওগাঁ যেলার মান্দা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুল ওয়ারেছ ও কাটলা শাখা 'আন্দোলন'-এর সদস্য আব্দুল আযীয।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত তাঁর বক্তব্যের পরে দিনাজপুর-পূর্ব ও পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি উভয় যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। এ সময়ে তিনি সমাজ সংস্কারে দাওয়াতের গুরুত্ব তুলে ধরে দায়িত্বশীলদেরকে নিয়মিতভাবে দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান।

যেলা সম্মেলন : রংপুর

পদ্মা ও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করুন!

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

২০শে এপ্রিল রবিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে নগরীর কৈলাশ রঞ্জন হাইস্কুল ময়দানে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেট ইলিয়াস আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত দাবী জানান। তিনি বলেন, উজানের দেশ হওয়ার কারণে ভারতের উচিৎ ছিল ভাটির দেশের পানির অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু তারা তার বিপরীতটা করেছে। বিগত ৪২ বছর ধরে তারা কেবল মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। অতএব সব রাখ-ঢাক ছেড়ে ১৬ কোটি মানুষের পানির অধিকার আদায়ের জন্য অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে আমীরে জামা'আতের বিবৃতি ২০শে এপ্রিল দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, মুহাম্মাদিয়া মাদরাসা হারাগাছের শিক্ষক যুলকারনাইন, রাশেদুল ইসলাম (পীরগঞ্জ) প্রমুখ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত তাঁর বক্তব্য শেষ করে পার্শ্ববর্তী শালবন মিস্ত্রিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। এ সময়ে তিনি যেলায় উভয় সংগঠনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেন এবং দায়িত্বশীলদের আখেরাতে জবাবদিহিতার স্বার্থে দ্বীনী কাজে অধিক সময় দেয়ার আহ্বান জানান।

যেলা সম্মেলন : রাজশাহী-দক্ষিণ

সবকিছু ত্যাগের বিনিময়ে জান্নাতের পথে এগিয়ে চলুন!

-আমীরে জামা'আত

২৩শে এপ্রিল বুধবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার বাগমারা থানাধীন ভবানীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী হ্যালিপ্যাড ময়দানে যেলা সম্মেলন'১৪ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই ময়দানে সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পরে মহামান্য প্রেসিডেন্টের আগমন ঘটেছিল। তারা আপনাদেরকে দুনিয়াবী সমৃদ্ধির আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা আপনাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাতে চাই। আসুন! আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাথে জামা'আতবদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারের ব্রতী হই।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, রাজশাহী-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুররুল হুদা, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম ও বাগমারা উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি যিল্লুর রহমান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাজী আইয়ূব আলী সরকার প্রমুখ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বক্তব্য শেষে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি যেলায় সাংগঠনিক কাজের খোঁজ-খবর নেন এবং সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের আহ্বান জানান।

প্রবাসী সংবাদ

হায়েল দোসার, দাম্মাম, সঊদী আরব ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম যেলার অন্তর্গত হায়েল দোসার এলাকার উদ্যোগে এক সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হয়। যেলা শাখার অর্থ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন (বরগুনা)-এর পরিচালনায় সভায় কর্মী ভাইদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন দাম্মাম শাখার সহ-সভাপতি জনাব যহীরুদ্দীন (কিশোরগঞ্জ)। তিনি দাওয়াতী কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সকলকে আরো অগ্রসর হওয়ার আহবান জানান। উক্ত সভায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট হায়েল দোসার এলাকা শাখা গঠন করা হয়। উক্ত শাখার দায়িত্বশীল ভাইরা হলেন, (১) সভাপতি : মীযান (লক্ষ্মীপুর) (২) সহ-সভাপতি : বরকতুল্লাহ (লক্ষ্মীপুর) (৩) সাধারণ সম্পাদক : কামাল হোসেন (লক্ষ্মীপুর) (৪) সাংগঠনিক সম্পাদক : মঈনুদ্দীন রাসেল (লক্ষ্মীপুর) (৫) অর্থ সম্পাদক : কাওছার (চাঁদপুর) (৬) প্রচার সম্পাদক: ছিদ্দীকুর রহমান (শরীয়তপুর) (৭) সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক : ইমরান (চাঁদপুর) (৮) সমাজকল্যাণ

সম্পাদক : বেলাল হোসেন (লক্ষ্মীপুর) (৯) দফতর সম্পাদক : আনোয়ার হোসাইন (চাঁদপুর)।

আল-খাফজী, সঊদী আরব ২৪শে মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আল-খাফজী শাখার উদ্যোগে শাখা কার্যালয়ে মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি তোফাযযল হোসাইন (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য এবং 'যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মুকাররম বিন মুহসিন। বৈঠকে সাংগঠনিক কার্যাবলী গতিশীল করার ব্যাপারে গঠনমূলক আলোচনা হয়। বৈঠকে পরিষদের সহ-সভাপতি রফীকুল ইসলাম (নরসিংদী), সেক্রেটারী শামীম হোসাইন (শরীয়তপুর), প্রচার সম্পাদক হাফেয রফীক (নোয়াখালী) সহ পরিষদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নাদি আল-ইসলামিয়া, আল-খাফজী, সঊদী আরব ২৬শে মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ এশা আল-খাফজী প্রবাসী বাঙ্গালীদের উদ্যোগে উক্ত ক্লাবে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আল-খাফজী শাখার সভাপতি তোফাযযল হোসেন (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মুকাররম বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানে জনাব দাঊদ আলী (নোয়াখালী), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহমান (ফেনী) সহ শতাধিক বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

দাম্মাম, সঊদী আরব ২৮শে মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে শাখার সহ-সভাপতি যহীরুদ্দীনের বাসভবনের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারী মুকাররম বিন মুহসিন। বৈঠকে শাখার সকল সদস্য সহ অন্যান্য কর্মী ও সুধীগণ উপস্থিত ছিলেন। শাখার সেক্রেটারী জনাব যহীর খানের পরিচালনায় বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

দাল্লাহ, দাম্মাম, সঊদী আরব ৩০শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম যেলার দাল্লাহ শাখার উদ্যোগে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম শাখা সভাপতি আব্দুল খালেক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আলোচকগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে তাওহীদের অমীয় বাণী প্রত্যেকের পরিবার ও সমাজে প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া সভায় সমাজকে তাওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জান ও মালের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় দাম্মাম শাখার অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন (বরগুণা)'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহীস্থ কেন্দ্রীয় মারকাযে সদ্য সমাপ্ত ২৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪-তে অংশগ্রহণের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি সবাইকে আগামীতে তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণ ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মারকায সফরের আহ্বান জানান। সভায় দাল্লাহ ও দাম্মাম শাখার দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৪

গত ১১ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল- মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'কর্মী সম্মেলন ২০১৪' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ৪ টি গুণ কারো মাঝে একত্রিত না হলে, তার দ্বারা সমাজে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না (১) নিরঙ্কুশ তাওহীদের বিশ্বাস (২) সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া (৩) সর্বদা জিহাদী জাযবা থাকা এবং (৪) আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হওয়া। তিনি বলেন, আদর্শ যুবশক্তিই সমাজ পরিবর্তনের মূল নিয়ামক। তারা দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড। অথচ সেই যুবশক্তিকে দেশের শত্রুরা আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করছে। ইসলামের অপব্যাখ্যা করে তারা মুসলমানদের কাফের ফৎওয়া দিচ্ছে ও তাদের রক্ত হালাল গণ্য করছে। এভাবে তারা ইসলামকেই বিতর্কিত করছে। অতএব এ ব্যাপারে 'যুবসংঘ'-এর প্রত্যেক কর্মীকে রাসূল (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে এসব বিভ্রান্ত তরুণদেরকে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরবের দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক শায়খ জাফর আব্দুল্লাহ ফায়েয (মালদ্বীপ)। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে এ সম্মেলনে দাওয়াত প্রদান করার জন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা। শত যুলুম-নির্যাতনের মুখেও তারা এ দাওয়াত থেকে সামান্যতম পিছপা হননি। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের যুবকদেরকে দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানে আলোকিত হতে হবে। এজন্য তাদেরকে যাবতীয় পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি বলেন, কাল ক্বিয়ামতের দিন যেন আমরা আজকের দিনের ন্যায় জান্নাতে একত্রিত হ'তে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন! সম্মানিত বিশেষ অতিথির আরবীতে প্রদত্ত বক্তৃতা অনুবাদ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয়

পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মিছবাহুল ইসলাম, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জামীলুর রহমান, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও আব্দুল লতীফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। উক্ত সম্মেলনে সরকারের নিকট ১১ দফা দাবী পেশ করা হয়।

আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর কোষাধ্যক্ষ-এর আগমন : মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে তাঁদের প্রাদেশিক সম্মেলনে দাওয়াত প্রদানের চিঠি নিয়ে এদিন আগমন করেন আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মীযানুর রহমান। যুবসমাবেশে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তার পূর্বে মারকাযী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, আপনাদের এই সুন্দর সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। আমাদের দেশে এত সুন্দর ও স্বাধীন পরিবেশ নেই। এখানকার অভিজ্ঞতা আমি স্বদেশে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তিনি সবাইকে তাঁর প্রাদেশিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২রা মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর (কানসাট) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক ইয়াসীন আলী প্রমুখ। যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ বিপুলসংখ্যক কর্মী সমাবেশে উপস্থিত ছিল। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং বাদ আছর আব্বাস বাজারে অবস্থিত কানসাট এলাকা কার্যালয় ও ইসলামী পাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা উদ্বোধন করেন। এখানে মাসিক 'আত-তাহরীক' সহ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ পাওয়া যায়।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পলিটেকটিক শাখা গঠন : বিরল বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত শেষে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে আগত ছাত্রদের সাথে সংক্ষিপ্ত বৈঠকে বসেন যেলা প্রশিক্ষণে আগত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এ সময়ে তারা ছাত্রদের সংগঠন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অতঃপর উপস্থিত ছাত্রদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদ বেলায়াত হোসাইনকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ সোহেল রানা ও মোস্তাক্বীমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মারকায সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী**, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে ২০১৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় মোট ২৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৪ জন জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ+) সহ ২৪ জন 'এ+' এবং ৭ জন 'এ' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। একজন অকৃতকার্য হয়েছে। সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত **মহিলা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা**, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে প্রথমবারের মত ৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৫ জন 'এ+', ৩ জন 'এ' এবং ১ জন 'ডি' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া **দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ**, বাঁকাল, সাতক্ষীরায় ২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন গোল্ডেন সহ ১৫ জন 'এ+' এবং বাকি ১০ জন 'এ' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' ভবন অবশেষে অবৈধ দখলমুক্ত

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে কুচক্রীদের অবৈধ দখলে থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখবর্তী কাজলাস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ৫তলা ভবনটি দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়ার পর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। গত ৭ই মে রাত্রি ১০ ঘটিকায় স্থানীয় কাউন্সিলর ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভবনটির দখল বুঝে নেন।

উল্লেখ্য, ভবনটি অবৈধ দখলদারদের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড অস্থায়ীভাবে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়াতে পরিচালিত হয়ে আসছিল। দীর্ঘদিন পরে হলেও শেষ পর্যন্ত অবৈধ দখল থেকে ভবনটি মুক্ত হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ফাউণ্ডেশনেব-এর প্রতিষ্ঠাতা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এর মাধ্যমে 'হাফাবা'-এর কার্যক্রম আরো সুচারু রূপে পরিচালিত ও সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করুন

-ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুবেশে আমাদের প্রাপ্য পানি কেড়ে নিচ্ছে। আর আমরা পানি বিহনে মরতে বসেছি। এরপরেও দায়িত্বশীল সরকারের কোন উচ্চবাচ্য নেই। এটা কোন বন্ধুত্ব? অতএব সব রাখ-ঢাক ছেড়ে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ভারত এ যাবত কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেনি। অতএব অনতিবিলম্বে আন্ত র্জাতিক আদালতে মামলা করুন। ১৬ কোটি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিন *(দৈনিক ইনকিলাব ২০ এপ্রিল'১৪-এ প্রকাশিত)*।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : অনেকে পেশাব করার পর ইস্তেঞ্জা বা পানি না নেওয়ার কারণে ছালাত আদায় করে না। এ ব্যাপারে শরী'আতে নির্দেশনা কি?

-ইশতিয়াক আহমাদ
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ পেশাব করার পরে ইস্তিঞ্জা না করা গুরুতর অপরাধ এবং কবরের শাস্তির অন্যতম কারণ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*। দ্বিতীয়তঃ ছালাত কবূলের পূর্বশর্ত হল, পবিত্রতা অর্জন করা *(বুখারী হা/১৩৫, মুসলিম হা/২২৪)*। সুতরাং ওযূ বা পানি না পাওয়ার শর্তে তায়াম্মুম ব্যতীত ছালাত কবুলযোগ্য হবে না। তবে ওয়াক্তের মধ্যে অপবিত্রতা দূর করা সম্ভব হলে শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে। তৃতীয়তঃ পোষাকের অপবিত্রতা দূর করার কোন উপায় না পেলে অথবা পোষাকটি খুলে ফেললে সতর ঢাকা সম্ভব না হ'লে উক্ত পোষাকেই ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬, বাক্বারাহ ২৮৬, আবুদাঊদ হা/৬৫০)*। অতএব কোন অবস্থায়ই ছালাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২/২৮২) : 'হিন্দুস্থানে একটি যুদ্ধ হবে এবং সেখানে শাহাদতবরণকারীগণ জান্নাতে যাবে' মর্মের বর্ণনাটির কোন সত্যতা আছে কি?

-ওমর ফারূক
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : ক্বিয়ামতের আলামত হিসাবে উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত ভাষায় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। একটি দল হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে আর দ্বিতীয় দল ঈসা ইবনু মারিয়ামের সাথে থাকবে *(নাসাঈ হা/৩১৭৫, ছহীহাহ হা/১৯৩৪)*। অর্থাৎ সেখানে তারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে *(মানাবী, শরহে জামে' ছাগীর ২/১৩২)*। তবে উপরোক্ত হাদীছ ব্যতীত এ মর্মে আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে, যেগুলি যঈফ *(নাসাঈ হা/৩১৭৩-৭৪, আহমাদ হা/৮৮০৯, সনদ যঈফ)*। স্মর্তব্য যে, হিন্দুস্থান বলতে কেবল বর্তমান ভারত নয়, বরং সমগ্র ভারত উপমহাদেশকে বুঝায়।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীর লাশ না পাওয়া গেলে উক্ত মাইয়েতের জানাযা ও দাফন-কাফনের বিধান কি?

-শরীফুল ইসলাম
শরীফপুর, গাযীপুর।

উত্তর : লাশ না মিললেও মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হ'লে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করতে হবে। কেননা জানাযার ছালাত মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যম। আর লাশ না পাওয়া গেলে দাফন-কাফনের বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : তাক্বদীর কি? এ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফরীদ আহমাদ
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তর : তাক্বদীর শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করা বা অনুমান করা। শারঈ পরিভাষায় তাক্বদীর হ'ল, আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ভবিষ্যত নির্ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে এবং তিনি যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই ঘটবে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। তাক্বদীর সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাক্বদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন। এজন্য রাসূল (ছাঃ) এ প্রসঙ্গে অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৯৮)*। একদিন ছাহাবায়ে কেরাম তাকে কেবল তাক্বদীরের উপর ভরসা করে সকল আমল ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানালে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা সৎকর্ম করে যাও। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য সেরূপ আমল এবং যারা দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্য সেরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে *(বুখারী হা/৪৯৪৯)*।

'তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস' মুমিনের মৌলিক ও অপরিহার্য ছয়টি আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। তাক্বদীর একটি গায়েবী বিষয়, যার রহস্য মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন। এজন্য সাধারণভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেমন একজন লোকের সামনে ফলের রস ভর্তি গ্লাস রাখা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে তা পান করতে পারে, নাও পারে। অর্থাৎ সে পান করতে বাধ্য নয়। অতঃপর যদি সে পান করে, তবে তা আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই রক্ষিত রয়েছে। আবার যদি পান না করে, তবুও তা আল্লাহর জ্ঞানে আগে থেকেই রক্ষিত আছে। যদি বলা হয় এর ব্যাখ্যা কি? এর জবাব এতটুকুই দেওয়া যায় যে, অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য মানুষের স্বল্পজ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষের সৎ-অসৎ যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বক্তব্যই প্রযোজ্য। একজন পাপাচারী পাপকর্মের দিকে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজ হাতে তা বাস্তবায়ন করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে আল্লাহর জ্ঞান বা পূর্বনির্ধারণ থেকে বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম

ক্ষমতা ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। এক্ষণে বান্দা যেহেতু নিজের তাক্বদীর জানে না, সেহেতু তাকে মন্দ কর্ম হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহ্র বিধান মেনে কাজ করে সুন্দর পরিণতি লাভের চেষ্টা করতে হবে। তার সাধ্যমত চেষ্টার পরেও যেটা ঘটবে, বুঝতে হবে সেটাই ছিল তার তাক্বদীরের লিখন।

মূলতঃ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে বিবেক-বুদ্ধি দান করে, ভালো আর মন্দ দু'টি পথ দেখিয়ে এক মহাপরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। আর ভালো পথের জন্য জান্নাত আর মন্দ পথের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন। ফলে বিবেক দিয়ে নিজ স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে মানুষ এ পৃথিবীতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু করবে, আল্লাহ তাঁর অগ্রিম জ্ঞানে সেগুলোর সব কিছু সম্পর্কে জানেন এবং সেগুলোই তিনি লিখে রেখেছেন।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তাক্বদীরের মন্দকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তিনি তাক্বদীরের ভাল-মন্দকে ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন *(রা'দ ৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ পাপকর্মের কারণে রূযী থেকে বঞ্চিত হয়। দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তন হয় এবং নেকীর মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৯২৫)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকায় প্রশস্ততা ও মৃত্যুতে বিলম্ব কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮)*।

কেউ কেউ 'ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, আমার কিছু করার নেই' বলে নিজেকে বিভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে যায়। অথচ দুনিয়ায় তারা না খেয়ে বসে থাকে না, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে পরীক্ষা দেয় না, পিপাসা লাগলে পানি না খেয়ে ভরসা করে না। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য তারা ভাগ্যের উপর ভরসা না করে চেষ্টা করে। কিন্তু যত ভরসা কেবল চিরস্থায়ী জীবনের ক্ষেত্রেই করে! এরূপ অপযুক্তির মাধ্যমে মানুষ কেবল নিজেকে ধ্বংসেই নিক্ষেপ করে। ভ্রান্ত ফের্কা অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াগণ এরূপ ভেবে থাকেন। অথচ আল্লাহ বান্দার তাক্বদীর জানেন। কিন্তু বান্দা তা জানেনা। তাই তাকে সাধ্যমত আল্লাহ্র পথে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'বান্দা কেবল সেটাই পায়, যেটার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : ৩ মাস পূর্বে একটি ট্রাক ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করেছি। যার মধ্যে ২৪ লক্ষ টাকা ঋণ রয়েছে। এক্ষণে আমার উপর যাকাত ফরয হয়েছে কি?

-ওমর বিন হোসাইন
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ট্রাকের ক্রয় মূল্যের উপর যাকাত লাগবে না। বরং ট্রাক থেকে উপার্জিত অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং তা একবছর সঞ্চিত থাকে, তাহলে ২.৫% হিসেবে যাকাত দিতে হবে। তবে নিছাব পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত না রেখে যদি ঋণ পরিশোধ করে সেক্ষেত্রে যাকাত প্রদানের প্রয়োজন হবে না। হযরত ওছমান (রাঃ) বলতেন, এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহলে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে তার যাকাত আদায় করবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩, ইরওয়া ৩/৩৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : জনৈক ব্যক্তি একটি কঠিন পাপকর্ম থেকে তওবা করার পর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় উক্ত গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। এক্ষণে উক্ত ব্যক্তির করণীয় কি?

-আব্দুল আউয়াল
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ঐ ব্যক্তি পুনরায় তওবা করবে *(যুমার ৫৩, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬)*। পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন সে অপরাধ থেকে বিরত থাকল। অতঃপর পুনরায় একই অপরাধ করল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ একই কথা বলে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর পুনরায় একইভাবে সে অপরাধ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ বললেন, 'সে যা ইচ্ছা করুক। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম' *(বুখারী হা/৭৫০৭, মুসলিম হা/২৭৫৮, মিশকাত হা/২৩৩৩)*। এ হাদীছ প্রমাণ করে ক্ষমা প্রার্থনার প্রধান বিষয়টি হ'ল 'আল্লাহভীতি'। কেবল আল্লাহ্র ভয়ে যদি বান্দা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে করুণাময় আল্লাহ ক্ষমা তাকে করতে পারেন।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন প্রমাণ আছে কি?

-আল-সামী
কুঠিবাড়ী, কমলাপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : সূরা যুমার ৫, ক্বাফ ৯, লোকমান ২৯, নাযি'আত ৩০ প্রভৃতি আয়াত সমূহ পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রমাণ বহন করে। উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ বলেন, يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ 'তিনিই দিবসের উপর রাত্রিকে এবং রাত্রির উপর দিবসকে আবেষ্টনকারী বানিয়েছেন' *(যুমার ৫)*। كَوْرٌ অর্থ গোল বানানো, মাথায় পাগড়ী পেচানো। এটাই পৃথিবী গোল হওয়ার অন্যতম প্রধান কুরআনী দলীল। কারণ এক দেশে যখন সূর্য অস্ত যায়, অন্য দেশে তখন সূর্যের উদয় হয়, এটাই পৃথিবীর গোলত্বের অকাট্য প্রমাণ। যা কুরআন বহু পূর্বে পেশ করেছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا 'আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত

করে দিয়েছি' *(ক্বাফ ৭)*। অর্থাৎ যা সর্বদা বিস্তৃত ও প্রশস্ত। মানুষ সারা জীবন চলতে থাকলেও পৃথিবীকে প্রশস্তই পাবে। আর এই অব্যাহত প্রশস্ততা কেবল তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবী গোল হয়। অন্য কোন আকৃতির হলে তা সম্ভব হবে না। কেননা সে সময় তাকে একটা না একটা সীমান্তে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু কোন প্রান্তসীমা পাওয়া বা সেখানে গিয়ে কোন গভীর গহ্বরে পড়ে যাওয়ার মত কখনো ঘটেনি'। বস্তুতঃ 'পৃথিবী গোলাকার' এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার অন্ততঃ এগারশ' বছর পূর্বে কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম তা উপস্থাপিত করেছে' *(আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ২৬৯-২৮০)*।

ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) সূরা যুমার ৫ আয়াত থেকে দলীল দিয়ে বলেন, 'নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণের কেউই পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। কিংবা এর বিরুদ্ধে তাদের কারু থেকে কোন বক্তব্য জানা যায়নি। বরং কুরআন ও হাদীছে এর গোলাকার হওয়ার পক্ষেই দলীল এসেছে *(ইবনু হাযম, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ১/৩৫২ 'পৃথিবী গোলাকার হওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বিখ্যাত বিদ্বান আবুল হুসায়েন আহমাদ বিন জাফর (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি বলেন, এর প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, 'পৃথিবীর কোন প্রান্তে সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্ররাজি একই সময়ে উদিত হয় না বা অস্তও যায় না। বরং পশ্চিমের আগে তা পূর্বে উদিত হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১৯৫)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : ওমর (রাঃ)-এর চিঠির মাধ্যমে নীলনদের পানি প্রবাহিত হওয়ার ঘটনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কর্ণেল আব্দুর রাকীব
কুলোনিয়া, পাবনা।

উত্তর : উক্ত চিঠির ঘটনাটি বহু বিশ্বস্ত ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/১০০; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ৪৪/৩৩৭; সুবকী, তাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা ২/৩২৬; সৈয়ূতী, তারীখুল খুলাফা ১/১১৩ প্রভৃতি। তবে দু'টি কারণে বর্ণনাটির সনদ খুবই দুর্বল (১) বর্ণনাটি দুর্বল রাবী ইবনে লাহি'আহ সূত্রে বর্ণিত। (২) ইবনে লাহি'আহ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ক্বায়েস বিন হাজ্জাজ মিসরীর নিকট থেকে। যিনি ষষ্ঠ স্তরের রাবী হওয়ার কারণে কোন ছাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি *(ইবনু হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব রাবী নং-৫৫৬৮)*। ফলে তিনি তাদলীসের দোষে অভিযুক্ত। অতএব ঘটনাটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : **বাংলাদেশের ন্যায় একটি দেশে সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীতে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি? এরূপ চাকুরীতে থাকা অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়, তাহ'লে তাকে 'শহীদ' বলা যাবে কি?**

-মুহাম্মাদ মুর্তাযা
ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গুনাহ ও অন্যায়ের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। সুতরাং যে যে অবস্থানে থাকুক না কেন, আল্লাহর বিধান মেনে অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশাসনিক যে কোন বাহিনীতে উপরোক্ত নির্দেশনা মেনে দায়িত্ব পালন করা দুঃসাধ্য। সেকারণেই সম্ভবতঃ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের উপরে এমন শাসকদের আগমন ঘটবে, যারা নিকৃষ্ট লোকদের কাছে টানবে এবং উত্তম লোকদের পিছনে সরিয়ে দিবে। তারা ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে, তারা যেন কখনোই তাদের গুপ্তচর, পুলিশ, কর আদায়কারী এবং রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত না হয়' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৮৬, মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/১১১৫; ছহীহাহ হা/৩৬০)*। অতএব বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনে এসব চাকুরী থেকে দূরে থাকাই উত্তম।

'শহীদ' সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, 'জিহাদ' অধ্যায়)*। তিনি বলেন, যে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই-ই মাত্র আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৪)*। সুতরাং যদি কেউ এসব বাহিনীতে চাকুরী করা সত্ত্বেও অমুসলিমদের আক্রমণ থেকে মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর কালেমা বা তাঁর বিধানকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে জীবন বিলিয়ে দেন, তিনি শহীদী মর্যাদা লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। তবে কাউকে 'শহীদ' লকবে ভূষিত করার কোন সুযোগ নেই। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, কেউ যুদ্ধে নিহত হলে বা মারা গেলে তোমরা বলে থাক 'অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে'। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বলো যেরূপ রাসূল (ছাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হ'ল বা মৃত্যুবরণ করল, সে ব্যক্তি শহীদ' *(আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করা জায়েয হবে কি?

-সালমা আখতার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : হায়েয এবং নিফাসের অবস্থায় ই'তিকাফ করা যাবে না। যদি ই'তিকাফ অবস্থায় হায়েয শুরু হয়ে যায় অথবা সন্তান প্রসব হয়ে যায়, তবে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) ঈদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঋতুবতী নারীদেরকে নির্দেশ দিলেও তাদেরকে ছালাত আদায় থেকে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*। তবে ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করতে পারবে *(বুখারী হা/৩১০-৩১১)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : প্রতি মাসে দিন নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-নাজমুল হাসান, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : শরী'আত নির্দেশিত দিনগুলি ব্যতীত মাসের কোন দিনকে ছিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। শরী'আত নির্ধারিত ছিয়াম যেমন প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার *(আহমাদ হা/৮৩৪৩, ছহীহুল জামে' হা/৪৮০৪)*, আরবী মাসের ১৩,১৪,১৫ *(বুখারী হা/১৯৮১, নাসাঈ হা/২৪২০)* অথবা একদিন পর পর ছিয়াম পালন করা *(বুখারী হা/১৯৭৬)* ইত্যাদি। আর শুক্রবারকে নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/১৯৮৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : পিতা-মাতার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজ্জের নেকী লাভ করা যায় মর্মের বক্তব্যটি কি সঠিক?

-আব্দুর রাকীব
জামালপুর।

উত্তর : বর্ণনাটি মওযূ বা জাল। কারণ এর একাধিক বর্ণনা সূত্রে অধিকাংশই যঈফ ও অপরিচিত রাবী রয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৯৮)*। তবে পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইসরা ২৩-২৪; তিরমিযী হা/১৮৯৯; নাসাঈ হা/৩১০৪; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২ প্রভৃতি।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : শোনা যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে আব্বাসীয় শাসনামলে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলী খান
ডোগাইর, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর : ঘটনা সঠিক। আব্বাসীয় খলীফা মামূন (১৯৮-২১৮ হিঃ), মু'তাছিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হিঃ) এবং ওয়াছিক বিল্লাহ (২২৭-২৩২ হিঃ)-এর শাসনামলে 'কুরআন সৃষ্ট কি-না?' এ বিষয়ে বিতর্কের উপর ভিত্তি করে মু'তাযেলী আলেমদের চক্রান্তে খলীফাত্রয় তাঁর উপর এ নির্মম নির্যাতন চালান। এসময় তাঁকে দীর্ঘ ২৮ মাস কারা জীবন, বহু বেত্রাঘাত ও গৃহবন্দীত্বসহ বিবিধ শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হয় *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১০/৩৩০)*। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর উপর নির্মম অত্যাচারের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে *(সুবকী, তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ ১/৩৩৫; ইবনুল জাওযী, মানাক্বিব পৃঃ ৪০৯-১০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/২০৯-১০)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তাঁর নিকটে এমন গোপন ইলম রয়েছে, যা প্রকাশ করলে তার কণ্ঠনালী কর্তিত হবে। কেউ কেউ এই গোপন ইলম দ্বারা ছূফীদের বাতেনী ইলমকে বুঝাতে চান। এক্ষণে উক্ত গোপন ইলম বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

-আবুল কাসেম
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত গোপন ইলম সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) স্বয়ং কিছু বলেননি। তবে মুহাদ্দিছগণ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি যা গোপন করেছিলেন, সেগুলি খুলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী মন্দ আমীর-ওমারাদের নাম, পরিচয়, সময়কাল, অবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত ছিল। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাদের কারু প্রতি ইঙ্গিত করলেও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি *(ফাৎহুল বারী হা/১২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

কুরতুবী বলেন, এগুলি ছিল তৎকালীন ফিৎনা-ফাসাদ, হত্যা এবং মুনাফিক ও মুরতাদ নেতাদের পরিচয় সম্পর্কিত বিষয় *(তাফসীর কুরতুবী ২/১৮৬, বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এর সাথে ভ্রান্ত ছূফীদের বাতেনী ইলমের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এগুলি অনেক পরের সৃষ্টি। তাছাড়া তার গোপনকৃত বিষয়টি কোন শরী'আত সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল না *(কুরতুবী ২/১৮৬; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৫৯৭; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১/২১৬)*।

এছাড়া 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)* আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব সেখানে বাতেনী বা গোপন কোন ইলম বাকী থাকার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : বিভিন্ন স্থানে লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) গাছ লাগিয়েছেন, তাই আমাদেরকে গাছ লাগাতে হবে'। এটা কি সঠিক?

-ইয়াসমীন, ভাটাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : তিনি স্বহস্তে গাছ লাগিয়েছেন একথা ঠিক। রাসূল (ছাঃ) সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর দাসত্বমুক্তির জন্য চুক্তিকৃত জমিতে বরকতের উদ্দেশ্যে নিজ হাতে খেজুর গাছের চারা রোপণ করেছিলেন *(আহমাদ হা/২৩৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯৪)*। এটি কোন বাধ্যগত বিষয় নয়। বরং তিনি গাছ লাগানোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে, অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশু-পক্ষী বা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী হা/৬০১২, মুসলিম হা/১৫৫২)*। তিনি এটাকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্যতম উৎস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত বান্দার সাতটি আমল প্রবহমাণ থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষাদান (২) নদী-নালা প্রবাহিত করণ (৩) কূপ খনন (৪) খেজুর বৃক্ষ রোপণ (৫) মসজিদ নির্মাণ (৬) কুরআন বিতরণ (৭) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(মুসনাদে বাযযার হা/৭২৮৯, বায়হাক্বী শু'আব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯১৫)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের সংখ্যা কত ছিল?

-রায়হানুল হক
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : ছাহাবায়ে কেরামের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে ছহীহ সূত্রে কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উস্তাদ আবূ যুর'আহ্ রাযী এর সংখ্যা এক লক্ষ চৌদ্দ হাযার বলে উল্লেখ করেছেন *(খতীব বাগদাদী, আল-জামে' ২/২৯৩)*। কারো মতে, এর সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। সৈয়ূতী এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(সাফারীনী, গিযাউল আলবাব ১/৩১)*। ৯ম হিজরীতে তাবুক অভিযানে গমনকালে রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ)-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাযার *(যাদুল মা'আদ ৩/৫২৬)*। এদের প্রত্যেকের পরিবারে গড়ে পাঁচজন করে সদস্য থাকলেও তাদের সংখ্যা দেড় লাখে পৌঁছে যাবে। তাছাড়া যুদ্ধে সবাই যাননি এবং যেতে পারেননি। অতঃপর বিদায় হজ্জে উপস্থিত তাঁর সাথী সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৪ হাযার *(সাখাবী, ফাৎহুল মুগীছ ৪/৪৯-৫৪)*। তাদের বাইরেও সারা আরবে বহু মুসলিম ছিলেন। যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দর্শন করেছেন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। অতএব ছাহাবীদের সংখ্যা সঠিক জানা না গেলেও তা যে অগণিত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : আমাদের মসজিদটি যে জমির উপরে স্থাপিত, তা ওয়াকফকৃত নয় আবার ক্রয়কৃতও নয়। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ধুবড়ী, আসাম, ইণ্ডিয়া।

উত্তর : কারো আপত্তি না থাকলে ছালাত শুদ্ধ হবে। তবে মসজিদের নামে স্থানটি ওয়াক্ফ করা যরূরী *(বুখারী হা/২৭৭৪)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : পালিত ছেলে-মেয়ে কি পালক পিতা-মাতার জন্য বা তাদের প্রকৃত সন্তানদের ক্ষেত্রে মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে? এদের কোন বয়সসীমা আছে কি?

-সোহরাব হোসাইন
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে না। পালকপুত্রকে রক্তসম্পর্কীয় পুত্র হিসাবে গণ্য করা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(আহযাব ৩৭, ৪০, তাফসীর ইবনে কাছীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালকপুত্র যায়েদ বিন হারেছার তালাক দেওয়া স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১১-১২ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। এর মাধ্যমে তিনি পালক ছেলে-মেয়ে যে মাহরাম নয়, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তাদের ক্ষেত্রে হুরমতের বিধান প্রযোজ্য হবে তথা পর্দা ফরয হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : ছালাতে ভুলক্রমে রাক'আত সংখ্যা কম হ'লে 'আল্লাহু আকবার' এবং রাক'আত সংখ্যা বেশী হ'লে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে হবে কি?

-আবুল হাসানাত
ভাটাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : না। বরং ছালাতরত অবস্থায় ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে, আর মহিলা মুক্তাদী হাত দ্বারা হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দের মাধ্যমে লোকমা দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮, 'ছালাত অবস্থায় অসিদ্ধ ও সিদ্ধ আমলসমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : মৃত্যু যন্ত্রণা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার উপায় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রাযযাক, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : মুসলিম ব্যক্তি শরী'আতের যথাযথ অনুসারী হয়ে সার্বিক জীবন পরিচালনা করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে নিয়মিতভাবে 'সূরা মুলক' প্রতিদিন তেলাওয়াত করলেও কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা করা যায় *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪০)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে' *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*। এছাড়া মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ চাইতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৩৯)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : প্রচলিত ঈছালে ছওয়াব অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি শরী'আতে আছে কি? এসব অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়া বা উপস্থিত হওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?

-একরামুল কবীর, আগরদাঁড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : শরী'আতে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি নেই। বরং এরূপ অনুষ্ঠানের নামে যা কিছু হয়ে থাকে সবই স্পষ্ট বিদ'আত। অতএব এখানে অংশগ্রহণ করা, সহযোগিতা করা বা বক্তব্য প্রদান করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। 'ঈছালে ছওয়াব' অর্থ ছওয়াব পৌঁছানো। অথচ প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব আল্লাহই তাকে দিবেন। তাঁর নিকটে কারু ছওয়াব পৌঁছাতে হবে না যে সেটা নিয়ে তিনি তাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইলম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, যদি কোন মুমিন পুরুষ বা নারী অন্য কোন মুমিনের জন্য দো'আ করে, তাহলে আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে নেকী লিখেন' *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৬০২৬)*। তিনি বলেন, কোন মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তার পিছনে দো'আ করলে তা অবশ্যই কবুল (مستجابة) হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে, তখনই ঐ ফিরিশতা বলে, 'আমীন'! তোমার জন্যও অনুরূপ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮)*। অতএব ঈছালে ছওয়াবের নামে ও আখেরী মোনাজাতের নামে প্রচলিত লোক দেখানোর অনুষ্ঠানসমূহ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : কাপড় ধৌত করার পরে পুরোপুরি পবিত্র করার লক্ষ্যে বিসমিল্লাহ বলে পৃথকভাবে তিনবার পানিতে ডুবানোর প্রথাটি শরী'আতসম্মত হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
ফুলবাড়ী গেট, খুলনা।

উত্তর : যেকোন কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। কিন্তু কাপড় ধৌত করার পরে পুরোপুরি পবিত্র করার

লক্ষ্যে বিসমিল্লাহ বলে পুনরায় তিনবার পৃথকভাবে পানিতে ডুবানোর প্রথাটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বরং পানি দ্বারা কাপড়ের নাপাক অংশটুকু একবার ধুয়ে নিলেই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে *(তিরমিযী হা/১৩৮)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : পিতা-মাতা কর্তৃক ছেলে বা মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি? এরূপ বিবাহের পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে উক্ত ছেলে বা মেয়ে গুনাহগার হবে কি?

-হারূনুর রশীদ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : এভাবে বিবাহ প্রদান শরী'আতসম্মত নয়। বিবাহ দেওয়ার জন্য সাবালক ছেলে-মেয়ের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। জনৈক সাবালিকা মেয়েকে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিবাহ দিলে রাসূল (ছাঃ) মেয়ের আপত্তির কারণে উক্ত বিবাহ বাতিল করে দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৩)*। একইভাবে কোন সাবালিকা মেয়ে তার পিতা বা বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করলে উক্ত বিবাহ বাতিল হবে' *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*। অতএব পিতা ও মেয়ে উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি ও অনুমতির মাধ্যমে বিয়ে হ'তে হবে। তবে সাবালক ছেলে স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাকে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রেখে বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(বায়হাক্বী শু'আব হা/৭৮২৯, তিরমিযী হা/১৮৯৯, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

জোরপূর্বক বিবাহ দিলে ছেলে বা মেয়ের তা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এতে তারা গুনাহগার হবে না। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ছেলের অসম্মতিতে তাকে কারো সাথে বিবাহ দেওয়ার অধিকার পিতা-মাতার নেই। আর অসম্মতি জানানোর কারণে সে অবাধ্য (عَاقٌّ) হিসাবেও গণ্য হবে না' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/৩০)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : জনৈক ইমাম সঠিক পথে ফিরে আসায় চাকুরী হারানোর ফলে পুনরায় হক ছেড়ে দিয়ে মাযহাবী আমল শুরু করে চাকুরী ফিরে পেয়েছেন এবং বলছেন, ধীরে ধীরে মানুষকে হকের পথে আনতে হবে। এক সময় সবাই ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে গেলে আমিও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল শুরু করব। দাওয়াতের এ পদ্ধতি কি শরী'আতসম্মত?

-মুহাম্মাদ নো'মান, মুসলিমপাড়া, ফরিদপুর।

উত্তর : হক পাওয়ার পর দাওয়াত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এভাবে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা নিতান্তই গোমরাহী। আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি বলে দাও যে, হক আসে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে। অতঃপর যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, আর যে চায় তা প্রত্যাখ্যান করুক। আমরা যালেমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহফ ১৮/২৯)*। সুতরাং হক ছেড়ে কোন সুবিধাবাদী পথ অবলম্বন করা কখনো দাওয়াতের সঠিক কৌশল নয়। রাসূল (ছাঃ)-কে পরকালীন সফলতা অর্জনকারী 'গোরাবা'দের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, তারা হ'ল অধিক সংখ্যক বদকার লোকদের মধ্যে অবস্থানকারী অল্পসংখ্যক সৎ মানুষ। যাদের অবাধ্যতাকারীদের সংখ্যা তাদের আনুগত্যকারীদের চাইতে বেশী হবে' *(আহমাদ হা/৬৬৫০, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুনিয়াতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হ'ল নবীগণ, অতঃপর নেকী অনুপাতে অধিক নেককার ব্যক্তিগণ' *(তিরমিযী হা/২৩৯৮, ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩)*। অতএব যতটুকু হক পাওয়া গেছে, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে আপোষহীন ভাবে তার অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য পথ খুলে দেন' 'এবং এমন পথে রূযী দান করেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তাঁর জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। তবে দাওয়াতী কর্মে ও আচরণে সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবেন এবং মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করবেন *(হামীম সাজদাহ ৩৪; বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৬)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : হক-বাতিল প্রকাশের ক্ষেত্রে বড়দের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এছাড়া বড়দের নাম ধরে ডাকায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আশিক
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : হক প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কিছুতেই বাধা নেই। তবে সর্বাবস্থায় বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। হক কথা বলার সময়ও সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(আবুদাঊদ হা/৪৯৩৯, তিরমিযী হা/১৯২০, ছহীহাহ হা/২১৯৬)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই প্রবীণ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৪৩, মিশকাত হা/৪৯৭২)*। এছাড়া গুরুজন সর্বদা সম্মানের পাত্র এবং সবদেশেই পরস্পরে সম্মানসূচক অথবা স্নেহব্যঞ্জক লকবে ডাকার প্রচলন রয়েছে। তাই সম্মানসূচক সম্বোধনেই তাদের ডাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : জনৈক আলেম বলেন, নফল ছালাতে ছানা পাঠ করার কোন বিধান নেই। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুল্লাহ মোস্তফা
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। ছালাত ফরয হোক বা নফল হোক, সকল ছালাতেই ছানা পাঠ করা সুন্নাত। কেবল জানাযা ছালাতে নয়। কারণ জানাযা ছালাতে ছানা পড়ার কোন দলীল নেই *(শারহুল মুনতাহা ৩/৬০)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : বিবাহের রাত্রে বর ও কনেকে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-সোহাইল
মহাখালী, ঢাকা।

উত্তর : এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন আমল বা নির্দেশনা পাওয়া যায়না। তবে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আবু

যর, হুযাইফা (রাঃ) সহ একদল ছাহাবা হতে মওকূফ সূত্রে এরূপ নির্দেশনা পাওয়া যায় *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৪৩৮, ১৭৪৪১; আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃঃ ৯৪, সনদ ছহীহ)*। অতএব উক্ত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এটি স্ত্রী যখন বাসর ঘরে স্বামীর নিকটে যাবে, তখন পড়বে। স্বামী সম্মুখে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়িয়ে জামা'আত করবে। এসময় তারা ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্র নিকটে পানাহ চাইবে।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : মৃত মুরগীর পেট থেকে ডিম বের করে খাওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ডিম যদি পূর্ণরূপ ধারণ করে এবং তাযা থাকে, তবে তা খেতে বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, তোমাদের উপর পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে এবং সকল খবীছ বস্তু হারাম করা হয়েছে *(আ'রাফ ১৫৭)*। এখানে মৃত্যুর কারণে মুরগী হারাম হলেও তার তাযা ডিম হারাম নয়।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : কত বছর বয়সে মেয়েদের জন্য পর্দা করা ফরয হয়?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, বনানী, ঢাকা।

উত্তর : এর জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়স নেই। শারীরিক গঠনে পরিবর্তন দেখা দিলে এবং সাবালিকা হ'লে তার উপর পর্দা ফরয হয়ে যায়। তবে সাবালিকা হওয়ার পূর্ব থেকেই পর্দার অভ্যাস গড়ে তোলা যরূরী *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/২১৯)*। ছাহাবায়ে কেরাম তাদের শিশুদের ছালাত ও ছিয়ামের প্রশিক্ষণ দিতেন। এমনকি ছিয়ামরত শিশুদের খেলনা দিয়ে খাবারের কথা ভুলিয়ে রাখতেন *(বুখারী হা/১৯৬০, মুসলিম হা/১১৩৬)*। সাধারণতঃ নয় বছর বয়সে মেয়েরা সাবালিকা হয়। যেমন আয়েশা (রা) বলেন, যখন কোন শিশু নয় বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন সাবালিকা হয়ে যায় *(তিরমিযী হা/১১০৯)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : পবিত্র কুরআন কোন অমুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য স্পর্শ করতে চাইলে তার জন্য ওযূ করার আবশ্যকতা আছে কি?

-ফজর আলী, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিমের জন্য আরবী মূল কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পবিত্র ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৭৭৮০)*। এটা ছোট ও বড় উভয় পবিত্রতাকে শামিল করে। আর অমুসলিমরা উভয় দিক দিয়েই অপবিত্র। তবে অমুসলিমদের জন্য কুরআন শ্রবণ, কুরআনের তাফসীর বা অনুবাদ সহ কুরআন স্পর্শ করে পড়ায় বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৪/৩৪০)*। নিঃসন্দেহে তাকে পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে স্পর্শ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : পুরুষদের জন্য হাতে বা নখে মেহেদী মাখা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-শামীম হাসান, গোলাপবাগ, জামালপুর।

উত্তর : সৌন্দর্যের জন্য পুরুষদের হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয নয় *(ইবনু হাজার, ফৎহুল বারী হা/৫৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। কারণ মেহেদী এক ধরনের রঙ। আর পুরুষদের জন্য রঙ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জেনে রাখো যে, পুরুষদের খোশবূ এমন, যাতে সুগন্ধি আছে রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের খোশবূ এমন, যাতে রং আছে সুগন্ধি নেই *(তিরমিযী হা/২৭৮৭, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। এছাড়া তিনি পুরুষদের জন্য রঙ থাকার কারণে জাফরানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৪৬, মুসলিম হা/২১০১, মিশকাত হা/৪৪৩৪)*। তবে চিকিৎসার প্রয়োজনে যে কোন স্থানে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয আছে *(তিরমিযী হা/২০৫৪, ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭১, ছহীহাহ হা/২০৫৯)*। এছাড়া মাথার চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা উত্তম *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪৫১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : কেউ হজ্জ-এর নিয়ত করার পর মৃত্যুবরণ করলে হজ্জের নেকী পাবে কি এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হবে কি?

-আব্দুর রঊফ, আসাম, ভারত।

উত্তর : হজ্জ বা যেকোন নেক আমলের নিয়ত করে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে উক্ত আমলের নেকী পাবে বলে আশা করা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও পাপ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, তার আমল নামায় ১০ থেকে ৭শ'র অধিক নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপের সংকল্প করে অথচ করেনা, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখেন। আর যদি সে সংকল্প করে এবং ঐ পাপ করে, তাহ'লে তার জন্য মাত্র একটি পাপ লেখা হয়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ)*। তবে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা উচিৎ। এজন্য প্রথমে নিজের হজ্জ করবে। অতঃপর ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করবে *(আবুদাঊদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) রামাযানে ৬১ বার কুরআন খতম করতেন। উক্ত ঘটনার সত্যতা আছে কি?

-শামসুল ইসলাম, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : ঘটনাটির কোন সত্যতা নেই। আর এটি নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী। কারণ তিনি বলেন, তিনদিনের কমে কুরআন খতমকারী তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না *(তিরমিযী হা/২৯৪৯, মিশকাত হা/২২০১)*। তাছাড়া এটি অসম্ভব বিষয়। এ ধরনের ঘটনা বরং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে *(আল-আক্বাইদ আল-ইসলামিয়াহ, পৃঃ ৪৫)*। অনুরূপ আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁর নামে সমাজে প্রচলিত রয়েছে, যেগুলির কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : জনৈক আলেম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বুকে ফুঁক দিলে সেই বুক জাহান্নামে যাবে না। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-কাওছার আলম,

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : একথা ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূল (স) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে তার কোনই বাধা থাকে না *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, মিশকাত হা/৯৭৪; ছহীহাহ হা/৯৭২)*। এছাড়া শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে না পারে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : সূরা বাক্বারাহ ১১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

রাকীবুল ইসলাম
দমকল, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন, আর আল্লাহ্র জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন যে, ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের পর বাক্বারাহ ১৪৪ ও ১৫০ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলকে পুনরায় কা'বা গৃহের দিকে কিবলা করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে ইহুদীরা বাহানা খুঁজে পায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তারা নানাবিধ উপহাসমূলক কথাবার্তা বলতে থাকে। এর প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, সকল দিকই আল্লাহ্র। তিনি স্বীয় বান্দাদের যেদিকে খুশী সেদিকে ফিরে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিতে পারেন। এতে ইহুদী বা অন্য কারু খুশী বা নাখোশ হওয়ার কিছু নেই।

অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, ঘনঘটাময় অন্ধকার রাত্রিতে দিকহারা মুছল্লী কিবলায় ভুল করলেও তার ছালাত জায়েয হবে মর্মে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা এক অন্ধকার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন আমরা কেউ কিবলা চিনতে পারলাম না। ফলে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা মতে কিবলা নির্ধারণ করে ছালাত আদায় করি। সকালে আমরা বিষয়টি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে পেশ করি। তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী সনদ হাসান; আলবানী, ইরওয়া হা/২৯১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে নিজ সওয়ারীতে ছালাত আদায় করেছিলেন কিবলা নির্ধারণ ছাড়াই। তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়' *(বুখারী হা/১০৯৬; মুসলিম হা/৭০০; নাসাঈ, আবুদাঊদ হা/১২২৪ ইত্যাদি)*।

এর দ্বারা ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় পরিবহনের নির্দেশনা অনুযায়ী যেকোন দিকে ফিরে নফল ছালাত আদায় করা জায়েয। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(কুরতুবী)*।

অত্র আয়াতে وَجْهُ اللهِ অর্থ 'আল্লাহ্র চেহারা'-এর অর্থ তাঁর কুদরত বা অন্য কিছু বলা যাবে না। তাতে প্রকাশ্য অর্থের বিরোধিতা হবে এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত হবে। যারা আল্লাহকে 'নিরাকার' বলেন এবং কোন শূন্য সত্তার উপাসনা করেন, তারা আল্লাহ্র এই সকল ছিফাতের এবং অপব্যাখ্যা করেন এবং আল্লাহ্র হাত, চোখ, চেহারা, পায়ের নলা ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত আয়াত সমূহের নানাবিধ রূপক অর্থ করেন, যার কোনটাতেই তারা একমত হতে পারেননি।

অত্র আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল পূর্ব ও পশ্চিমে আল্লাহ্র ইলম সীমিত নয় কিংবা কিবলামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য কা'বা গৃহ বা বায়তুল মুক্বাদ্দাস পূজা করা নয়। বরং ইবাদতে শৃংখলা স্থাপন ও আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ একনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ছালাতে কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়াতের শেষে একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বব্যাপী। 'তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আর সেগুলিকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : ইস্তেখারাহ কি? এর ফযীলত ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তেখারাহ করা যায়?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ইস্তিখারাহ ঐ ছালাতকে বলা হয়, যার মাধ্যমে দোদুল্যমান বিষয়ে আল্লাহ্র নিকটে ফয়ছালা কামনা করা হয়। যে বিষয়ের পরিণতি সম্পর্কে বান্দা অজ্ঞাত, এর মাধ্যমে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল বিষয়ে ইস্তিখারাহ করার শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি কুরআনের সূরাসমূহ শিক্ষা দিতেন *(বুখারী হা/৬৩৮২)*।

ইস্তিখারাহ সকল কর্মকাণ্ডে সফলতা অর্জনের সর্বোত্তম উপায়। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে কেবল আল্লাহ্র উপর সঁপে দেয়। অতঃপর তাঁর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ এ দু'টি বিষয়ের উপরেই মানুষের হৃদয়ের প্রশান্তি নির্ভর করে এবং এদু'টিই হ'ল তার সৌভাগ্যের সোপান। বান্দা যখন পূর্ণ ঈমানের সাথে কোন বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে, তাতে তিনি সাড়া দেন। তাই ইস্তিখারাকে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল দোদুল্যমান বিষয়ে পূর্ণ আস্থার সাথে ইস্তিখারাহ করা বান্দার জন্য কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : জানাযার ছালাতের কোন তাকবীর ছুটে গেলে ইমামের সালামের শেষে বাকী অংশ আদায় করতে হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : জানাযার যে কয়টি তাকবীর ছুটে যাবে মুছল্লী তা ইমামের সালাম ফিরানোর পর আদায় করে নিবে। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬)*। তবে তা আদায় না করলেও দোষ নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : চৈত্র মাস আসলে বাজারে ১লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে বৈশাখ সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি সম্বলিত কাপড় পাওয়া যায়। এগুলি বেচা-কেনা করা জায়েয হবে কি?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : 'বৈশাখ' উদযাপন একটি অনৈসলামী প্রথা। যা থেকে মুসলিমকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দু'দিন উৎসব পালন করতাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এ দু'দিনের পরিবর্তে দু'টি উত্তম উৎসব দান করেছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা' *(আবুদাঊদ হা/১১৩৪, মিশকাত হা/১৪৩৯, 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায়)*। ঐ দু'টি দিন ছিল 'নওরোজ' বা নববর্ষ। অর্থাৎ সৌরবর্ষের প্রথম দিন এবং 'মেহেরজান' বছরে এইদিন রাত্রি-দিন সমান হয়।

মুবারকপুরী বলেন, 'উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দুই দিন ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় উৎসব রহিত করেছেন এবং তার মুকাবিলায় উক্ত দু'টি দিনকে সাব্যস্ত করেছেন। মাযহার বলেন, 'নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজান সহ কাফিরদের যাবতীয় উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছে তার দলীল রয়েছে'। ইবনু হাজার বলেন, 'মুশরিকদের উৎসব সমূহে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অপসন্দনীয় প্রমাণিত হয়েছে'। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর হানাফী বলেন, 'এসব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে একটি ডিমও উপঢৌকন দিল, সে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করল'। কাযী আবুল মাহাসেন হাসান মানছূর হানাফী বলেন, 'এ দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐ সব মেলা থেকে কোন জিনিষ ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয়, সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণভাবেও যদি এই মেলা থেকে কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিনে কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও মাকরূহ' *(মির'আত শরহ মিশকাত, 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায় ৫/৪৪-৪৫ পৃঃ)*।

অতএব উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা জায়েয নয়। বৈশাখ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি মূলতঃ হিন্দুয়ানী প্রথা সঞ্জাত। সুতরাং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতা, অংশগ্রহণ, আয়-উপার্জন সহ সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গুনাহ ও অন্যায়ের কাজে সাহায্য কর না *(মায়েদাহ ৫/২)*'।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : তাহাজ্জুদের ছালাত ফজরের আযানের পর পড়া যাবে কি?

-আব্দুল আউয়াল, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পড়া যাবে। তাহাজ্জুদ বা বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে 'উবাদাহ বিন ছামিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ ফজর ছালাতের আগে তা আদায় করে নিতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৩)*। এছাড়া বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম অথবা ব্যথার আধিক্যের কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে রাসূল (ছাঃ) দিনের বেলায় (সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে) ১২ রাক'আত পড়েছেন *(মির'আত ৪/২৬৬; মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : ইমাম জুম'আর ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মুনাফিকুন-এর ৯ম আয়াত পাঠ করেছেন। কিন্তু ১০ম আয়াতের অর্ধেক পাঠের পর বাকীটা মনে না আসায় রুকূতে চলে যান। ২য় রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা কাওছার পাঠ করেছেন। এতে 'ছালাত হয়নি' বলে আরেকজন হাফেয জোর করে ইমাম ছাহেবকে ছালাত পুনরায় পড়াতে বাধ্য করেন। এবিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কাজী শফিউর রহমান
কাজীপাড়া, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন এবং তার সাথে কুরআনের কিছু অংশ পড়েছেন। অতএব তাঁর ছালাত শুদ্ধ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ 'অতঃপর তুমি 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে'... *(আবুদাঊদ হা/৮৫৯, মিশকাত হা/৮০৪, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। তাকে পুনরায় ছালাত আদায়ে বাধ্য করে অন্যায় হয়েছে। অতএব ইমামের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি করা আবশ্যক।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

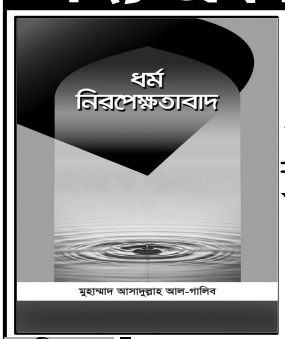

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রাপ্তিস্থান :
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১ ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০ ৮০০৯০০

Contents